বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা : এলাহাবাদ : পাটনা

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

শ্রীদীপঙ্কর বসু কর্তৃক জে. এন. বসু এ্যাণ্ড কোং, ৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট হইতে [illegible] ও আর. রায় (প্রিন্টকো), গুপ্ত কোম্পানী, ১৫, ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত।

উপলক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের উপলক্ষ্য নন, তিনি লক্ষ্য। উপলক্ষ্য হল শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন মহাশয়ের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। সাহিত্য-আকাদেমি কর্তৃক দিল্লী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মরণ-গ্রন্থে অধ্যাপক সেন এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। বর্তমান গ্রন্থ সেই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের প্রতিবাদ।

গ্রন্থখানির বৃহত্তর অংশ শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাই।

আর একটি কথা: এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ আছে কিন্তু কোনো স্তুতি-নিন্দা নেই, কোনো বিশি ভাববস্তুর মূল্যবিচার বা কাব্যবিচার নেই। যাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করবেন তাঁরা যেন এই কথাটি, অনুগ্রহ ক'রে, স্মরণে রাখেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীজানকীনাথ বসু মহাশয়কে। সর্ব-সমক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের সব ঝুঁকি তাঁর। আমার অগ্রজতুল্য, অধ্যাপক, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, জানকীবাবুর হাতে বই পৌঁছে না দিলে, এ বই হয়ত মাঠে মারা যেত। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ
ও
পাশ্চাত্য

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য রোম্যাণ্টিসিজম

উর্বশী

॥ ১ ॥

আখ্যাতেই আপত্তি হবে হয়তো। বিশ্বকবির ওপরে বিশ্বের প্রভাব তো পড়বেই। তা নিয়ে আবার কথা কি? কেউ আবার রবীন্দ্রসৃষ্টিতে প্রাচ্য বা ভারতীয় প্রভাবের সর্ব-ব্যাপকতা দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবেন যে এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কথা বলা মূঢ়তা বা উন্নাসিক একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। অনেকে আবার বলবেন, প্রভাবের কোন দেশগত প্রকৃতিবিশ্লেষণ চলে না—প্রভাব একটি দেশকালনিরপেক্ষ ত্রিশঙ্কু-কল্প পদার্থ, প্রায় কসমিক 'রে'র মত। অতএব যে যে ভাবধারা রবীন্দ্রনাথে এসে সম্মিলিত হয়েছে সেগুলির যথাসম্ভব নির্বিশেষ নাম দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল—যেমন পাশ্চাত্ত্য প্রভাব না ব'লে বলা হোক Bourgeois democratic Ideology, Renaissance Ideology, Humanist Ideology ইত্যাদি। কিন্তু সরষের মধ্যেই যে ভূত। এখনও 'মানবতাবাদ' না ব'লে যাথাযথ্যের খাতিরে আমরা হিউম্যানিজমই ব'লে থাকি আর রেনেসাঁস কথাটি উচ্চারণ না করলে তো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনাই হয় না। তাও-বাদকে যেমন চীন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না, নির্বাণের তত্ত্বকে যেমন ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম থেকে আলাদা ক'রে চিন্তা করা যায় না, তেমনি যায় না রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের ইউরোপের পরিবেশচ্যুত করা বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনাকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পটভূমি থেকে সরিয়ে নেওয়া। রবিবর্মার ছবি আঁকার শৈলীকে অবনীন্দ্রনাথের শৈলী থেকে পৃথক করতে গিয়ে কি আমরা প্রতীচ্য আর প্রাচ্য প্রভাবের কথা বলি না? প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পে গ্রীক এবং ছবিতে ও স্থাপত্যে ইস্‌লামীয় প্রভাবের কথা না হয় নাই তুললাম। এই জাতীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মানুষ শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক এবং প্রাণবস্তুর উৎস-সন্ধানের প্রাথমিক পর্যায় শুরু করে। বিশ্লেষণের পরে আসে সংশ্লেষ বা সামগ্রিক দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি রসোপভোগের। কিন্তু রসোপভোগ আর রসবিচার ভিন্ন পদার্থ। শেষেরটিতে

বিশ্লেষণের যে প্রয়োজন তা প্রথমটীতে দরকার নেই। আর সে বিশ্লেষণের প্রথম কথাই হল উপাদানগুলির দেশ-কালপাত্র-সাপেক্ষ শ্রেণী এবং প্রকৃতি বিচার। এ বিচার সমালোচক-আলংকারিকেরা চিরকাল ক'রে আসছেন—এদেশে এবং অন্যত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্বের দোহাই দিয়ে তাঁকে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ প্রমাণ করবার চেষ্টার অর্থ হল রবীন্দ্রনাথের মূল্য নির্ধারণের পথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তা ছাড়া, নিছক তত্ত্বের বিচারে হয়তো চরম পর্যায়ে দেশকালকে বাদ দিলেও চলে কিন্তু সাহিত্য তো তত্ত্ব নয়। সাহিত্য হল রূপসৃষ্টি—ভাবকে মূর্তিদান করা। সেই মূর্তি দেশকালবিধৃত। দর্শনের বিচারে আমরা অদ্বৈতবাদকে একটি অমূর্ত তত্ত্ব বলতে পারি, তবু বিশপ বার্কলে আর শঙ্কর দুইজনে মূলত ঐ একই তত্ত্বের প্রবক্তা হ'লেও প্রতীচ্যের ঐ তত্ত্ব আর প্রাচ্যের তত্ত্বে অনুষঙ্গঘটিত পার্থক্য অনেক। এমন কি একই শৈব ধর্ম কাশ্মীরে এক রকমের বিকাশ প্রাপ্ত হয় আর মাদ্রাজে আর এক রকমের। চৈতন্যলোকে কোন পরিবর্তনকেই দেশকালবিচ্যুত নির্বিশেষ তত্ত্ব হিসেবে দেখা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যে যদি এমন কোন ভাব বা ভাবগুচ্ছকে বিশ্লেষণমুখে পাওয়া যায় যার মূল উৎস প্রতীচী তাহলে সে কথা স্বীকার করাই সাহিত্যবিচারের চিরাচরিত ধারাসম্মত। এবং শুধু প্রতীচী না বলে সোজা ইংলণ্ডও বলা যেতে পারে, যদি দেখা যায় যে ইংলণ্ডই সে ভাবগুচ্ছের আদি জন্মস্থান। কেন না, ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতীচীর সম্পর্ক ইংলণ্ডের মাধ্যমে স্থাপিত না হ'য়ে যদি, ধরা যাক, মূলত ফ্রান্সের মাধ্যমে হত, যদি বাঙালী নাট্যকারেরা শেক্সপীয়রকে আদর্শ না ক'রে মলিয়েরকে আদর্শ খাড়া করতেন, শেলীকে বাদ দিয়ে উগো বা গোতিয়েকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সাহিত্যের রূপ অনেক বদলে যেত, আমাদের রুচি পর্যন্ত ধরত ফরাসী ভঙ্গী। মধুসূদনই এ কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে একমাত্র কবি যিনি সচেতন-ভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার চাষ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে ইউরোপখণ্ডের সংস্কৃতির নানা ধারা এসে মিশেছে, বিশেষ করে তাঁর পারিবারিক পরিবেশের জন্য। তিনি সেই প্রভাবের ফলে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য ভাষাও চর্চা করেছিলেন, কিন্তু প্রতীচ্যের প্রভাব তাঁর মানসে ইংরেজীকে বাহন ক'রেই প্রধানত এসেছে এবং সে ইংরেজী শুধুমাত্র ইংরেজের দর্শন মনন-সাহিত্যেরই পরিচয় বহন করে আনে নি, এনেছে প্রায় সারা ইউরোপের ভাবলোকের সম্পদকে; তবে সেই ভাবলোকের ঘ্রাণটিতে লেগেছে ইংরেজী আমেজ এবং সেই ভাবলোকের

কতকগুলি মৌলিক উপাদান অবশ্য একেবারে খাস ইংরেজী।

কিন্তু প্রভাব কথাটি, এখন দেখতে পাচ্ছি, বড় গোলমেলে; কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ঐ কথাটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেন। সম্প্রতি দিল্লী থেকে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক প্রকাশিত *Rabindranath : A Centenary Volume*-এ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন মহাশয় 'রবীন্দ্রকাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' নামীয় প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন—"The main stream of influences on Tagore's poetry is...of Sanskritic and Bengali origins ; western influence is just a tributary, (though a fine one at that) which joins in on the way...এবং সেটুকুও যে এমন কিছু নয় সে সম্পর্কেও সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—"It is difficult to recall any great passage of his poetry that would have been impossible without western influence." এর পরে তিনি উদাহরণসহযোগে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রকাব্যের যে যে স্থলকে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-গ্রস্ত ব'লে মনে করা হয় সেগুলি সবই প্রাচ্য ঐতিহ্যধারাপ্রসূত, কেন না, মূল খুঁজতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে 'এ দ্যুলোক মধুময়' বা 'ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো'র মূল সোজা পাওয়া যাচ্ছে 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' এই বৈদিক স্বস্তিবাচনে তা হ'লে আর Wordsworth-এর 'O there is blessing in this gentle breeze' কিংবা 'Magnificent the morning rose'-এ যাবার কি দরকার? যদি রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বর্ণনার কিছু কিছু রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের ঋতু-বর্ণনার অনুসারী হয় তাহলে আর তত্তৎ স্থলের মূলান্বেষণে প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক কবিদের দ্বারস্থ হওয়া অন্ধ দীনতা। নিশ্চয়ই আমরা 'ভালে তার লোধ্ররেণু' ইত্যাদির সূত্র 'নীতালোধ্র-প্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ'তেই খুঁজব। 'শেষের কবিতা'র অমিত গঙ্গার ধারে পিকনিক করতে গিয়ে একটি নিভৃত ক্ষণে লিলি গাঙ্গুলিকে বলেছিল, 'গঙ্গার ওপারে ওই নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনদিনই আর হবে না। ...তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি।' এতে যদি কারও মনে পড়ে:

Let us possess one world, each hath one, and is one.
My face in thine eye, thine in mine appears,
And true plain hearts do in the faces rest,

Where can we find two better hemispheres
Without sharp north, without declining west ? (Donne)

এবং

The instant made eternity....(Browning), তবে বলতেই হবে বিদগ্ধ পাঠকের সাদৃশ্য বা correspondence খুঁজে বেড়ানো বাতিক হয়েছে। এমন কি—

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

যদি Shakespeare-এর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণে আনে—

Eternity was in our lips and eyes,
Bliss in our brows' bent ; none our parts so poor,
But was a race of heaven.

তবু অনুকরণ বা প্রতিধ্বনির কথা বলা অনিশ্চয়তার মধ্যে পা ফেলা বইকি ! 'রাজা' নাটকের

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।...
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।

অথবা

আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী

কিংবা

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা-বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,—
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে"।

প'ড়ে কেউ যদি Shelleyর

> The desire of the moth for the star
> of the night for the morrow
> The devotion to something afar
> Beyond the sphere of our sorrow

লাইনগুলি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে ওঠেন তাহলে বলতে হবে যে তাঁরা ভারতীয় 'চরৈবেতি'র আর 'নেতিবাদে'র তত্ত্বের সন্ধান রাখেন না। এই জাতীয় প্রভাব-অন্বেষণকারীদের নেতৃত্ব করেন Edward Thomson সাহেব। তারক সেন মশায় এঁদের এই লঘুচিত্ত গোয়েন্দাগিরির সমুচিত জবাব দিয়েছেন, সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রভাব শব্দটাকে যদি কেবল বাচনিক প্রভাব বা শব্দগুচ্ছের প্রভাব হিসেবে দেখা হয় তাহলেই প্রাক্‌প্রদর্শিত পন্থায় প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। তারক সেন মশায় প্রভাব কথাটিকে মূলত সেই অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি দেখিয়েছেন যে প্রতীচ্যের কবিদের বাণীর অনুকৃতি বা অনুসরণ তো রবীন্দ্রনাথে নেই-ই, অন্যান্য সাহিত্যিক আন্দোলনের যেমন Symbolism, Verse libre ইত্যাদিরও রবীন্দ্র-মানসে কোন রেখাপাতের পূর্বেই তাঁর কবিতায় এ সবের আনাগোনা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোন গভীর (Profound) পঙ্‌ক্তির কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই প্রতীচ্যের কোন কবির কোন পঙ্‌ক্তির সঙ্গে এবং "The magnificence of Tagore's style in verse or prose owes *nothing* to western languages or literature, but is the joint product of his native power over words and his acquaintance with Sanskrit." (P. 257) সেন মহাশয়ের এই একরেখ, অনপেক্ষ, অধীর সিদ্ধান্তটি মধুসূদনোত্তর সমগ্র বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই নিম্নোদ্ধৃত অনস্বীকার্য বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন শোনায় ?

"য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে— কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

"য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে।

এ-কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটী হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্যে কিছু না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিষের পুনরাবৃত্তি আর কোন মতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে এ-কবি সে-কবির আক্ষরিক অনুকরণের কথা একেবারেই বলছেন না; তিনি বলছেন জীবনদর্শনের পরিবর্তনের কথা—প্রতীচ্যের ভাবধারার প্লাবনে বাঙালী এবং ভারতীয়ের, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের কথা—এক কথায় প্রাচ্যের গতানুগতিক Weltanschaunng-এর একটি বিশেষ রূপান্তর। জীবনদর্শনের সেই রূপান্তরের সাহিত্যিক বিকাশ কেমন ক'রে হয় তারও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য-সৃষ্টি" প্রবন্ধ থেকে উপরে উদ্ধৃত দুইটি অনুচ্ছেদের পরেই, মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের বস্তুমূল উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে, ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে এই জীবনদর্শন যখন বদলায় তখন তার বিকাশকল্পে যে আঙ্গিক (অর্থাৎ ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি) কবি প্রয়োগ করেন তারও আর কেবল **পূর্বানুবৃত্তি** হতে পারে না:

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলি অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী অশ্বে গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। যাহা চায়, তাহার জন্য, এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনও কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র

আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনও মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহা-দম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরে শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারি গলায় পরাইয়া দিল।"

রামাদিবৎ কায আর রাবণাদিবৎ অকায—এই যে আবহমান কালের জীবনদর্শনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হল মধুসূদনের মহাকাব্যে এবং ধ্বনিত হল পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সবল অনুপ্রবেশের ফলে, এ কি মধুসূদনেই শেষ হ'য়ে গেল, না, এই অনুপ্রবেশে আমাদের ভারতীয়ত্বের কোন মানহানি ঘটল? রবীন্দ্রনাথ দুটির কোনটিই ঘটেছে বলে মনে করেন নি। বরং তাঁর মতে, প্রভাবের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিকতা, এই পরস্পরে দেওয়া-নেওয়া আজকের বিশ্বে ঘটবেই। এ ঠেকানো সম্ভব নয়, কেন না এ জিনিস কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে ঘটে না।

"য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে;—এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক-কালের রামায়ণ কথার একটি নূতন বাঁধা তাঁর ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে,—দুর্বলের অভিমান বশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি,—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

"রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের সাহিত্যে যে একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে, তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি-বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক; এই চৈত্রমাসে যে ঘনঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল, সেও তো আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণ-পরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া কোথাও বা বিশেষ সুযোগ কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহ তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে। সে ছোট বড় কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক

এবং এক হইতে শতধারা হইয়া কত রূপরূপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানস-সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।"

পৃথিবীর মানুষের মনের গতি যখন এত বিচিত্র, এত জটিল, ভাবের জগতে ঢেউয়ের দোলা যখন এত অলক্ষ্যে, রাষ্ট্রনৈতিক সীমা অতিক্রম ক'রে, মনের গহনে গিয়ে ফেনায়িত হ'য়ে ওঠে, তখন অমন কোমর বেঁধে কি বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, রচনাশৈলীতে পাশ্চাত্ত্যের ছোঁয়া তো লাগেই নি, এমন কি ভাবের ক্ষেত্রেও তিনি প্রায় স্বয়ম্ভূ ?

ভাব বা বস্তুমূলের ক্ষেত্রে স্বায়ম্ভব হওয়াই যদি গৌরবের তাহলে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়রের স্থান কোথায় ? এমন কোনও জায়গা নেই যেখান থেকে তিনি বস্তু আহরণ করেন নি। আর সচেতন আহরণের কথা বাদ দিলে তো বলতে হয় যে শেক্সপীয়রের মধ্যে তৎকালের প্রতীচ্যের তাবৎ ভাববস্তুর সংশ্লেষ ঘটেছিল। যদি আবার মধ্যযুগীয় ইউরোপের শিভ্যালরির মধ্যে ইসলামের প্রভাব স্বীকার করি তাহলে ইউরোপীয় রেনেসাঁসে প্রাচ্যের দানও স্বীকার করতে হয়। তা ছাড়া সারা মধ্যযুগ ধ'রে আরবীয় সভ্যতার দানে ইউরোপ পরিপুষ্ট হয়েছে। মহাকবি Goethe তাঁর জীবনদর্শনের বিকাশে কালিদাসের কাছে কত ঋণী। ঋণী না হয়ে উপায় কি ? ভাবের জোয়ার ঠেকানো তো যায়ই না; ঠেকাতে গেলেও বিপদ। কেন না ঠেকাতে যাওয়ার পিছনে যে মনোভাব তা হল কূপমণ্ডুকতার, আচার বা রীতির অন্ধ অনুচিকীর্ষার। সে প্রবৃত্তি মনের বিস্তারের বদলে সঙ্কোচই ঘটায়; বাঁধাঘাটে মনকে বেঁধে রেখে, বিশেষ ক'রে আজকের পরিবর্ধমান বিশ্ব থেকে তাকে সন্তর্পণে আগলে রাখে। সে মনের দেবার কিছু থাকে না। রবীন্দ্রনাথ যে পাশ্চাত্ত্য-বিমুখ হন নি, বরং চেতনে-অচেতনে তাকে গ্রহণ করেছেন সে তাঁর মনের অনন্য-সাধারণ গৃহয়ালুতার নিদর্শন। সেই গ্রহণের ফলে তাঁর জীবনদর্শন কি রূপ গ্রহণ করেছে, সে জীবনদর্শন সার্থকতার পথে এগিয়েছে না চোরাবালির মধ্যে পড়েছে, তাঁর মানসলোকে দ্বন্দ্বের তীব্রতা বেড়েছে না দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে, এ সব কথা স্বতন্ত্র। এ সব হল মূল্যবিচারের কথা। সে বিচারে না নেমেও এ কথা বলা চলে যে পাশ্চাত্ত্যকে গ্রহণের ফলে তিনি যুগের মর্মকথাটিকে বাণীরূপ দিতে পেরেছেন, তিনি আধুনিক কালকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে যুগ-চৈতনার শ্রেষ্ঠ ধারক হয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যকে গ্রহণ না করলে তাঁকে

মধুসূদনেরও আগের যুগে ফিরে যেতে হত। অবশ্য তা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না, কেন না এই গ্রহণ করা না করাটা কোনও ব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।

বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা রবীন্দ্রমানসে এক জটিল ঐশ্বর্যময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। এই দ্বন্দ্বেই জাত মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য। প্রাচ্য ঐতিহ্য আর পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা—এই দুইয়ের সংঘাতে উদ্ভূত চেতনা রবীন্দ্রমানসে যে উপলমুখর, উচ্চাবচ, বিচিত্র, সর্পিল গতি সৃষ্টি করেছিল তাকে এ কালে প্রায় অনন্য বলা চলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন, রবীন্দ্রনাথ কেন, সেই বঙ্কিম থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত অনেকেই কামনা করেছেন কিন্তু ঘটাতে পারেন নি। কোন্ পথে যে ঘটবে বা আদৌ ঘটবে কি না, ঘটলে ফল কী হবে, তা বলা শক্ত। আবার ঘটতেই যে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথও এই মিলনের সম্ভাবনার কথা ভাবেন নি। তিনি স্বদেশী সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তখনই তিনি এ বিষয়েও সচেতন যে পাশ্চাত্ত্যকে ঠেকানো যাবে না। 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্ত্যের অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অনেক আগেই, যখন 'স্বদেশী সমাজ' লিখছেন তখনই, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলি পাটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়তে বিলম্ব হইল না"। ঐ ১৯০৪ সালে লেখা 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে রয়েছে আরও স্পষ্ট ভাষণ : "ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে।...বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এত স্বচ্ছ এবং সুদূরপ্রসারী যে ব্রিটিশ-শাসনের ফলশ্রুতির দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ

অবহিত এবং ঐ প্রবন্ধেই ব্রিটিশ-শাসনের আকস্মিক অবসানের ইঙ্গিতও তিনি করেছেন। তবু পাশ্চাত্ত্যের স্পর্শদোষ সম্পর্কে তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত তো ননই বরং তাকে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লেই স্বীকার করে যাচ্ছেন। এমন কি 'কালান্তর' বা 'সভ্যতার সংকট' প্রভৃতি প্রবন্ধেও তিনি ব্রিটিশ-সংস্পর্শের দ্বিমুখী প্রকৃতির কথা উল্লেখ ক'রে তবে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত সংকটের জন্য শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন : "সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।...এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত ক'রে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারের এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে **আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ** ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।... য়ুরোপীয় **জাতির স্বভাবগত সভ্যতার** প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল।...অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনও জাতির কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন।"

তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সচেতনে অচেতনে পাশ্চাত্ত্য পরিহারের প্রশ্ন যে কি ক'রে উঠতে পারে তা বুঝি না। অমুক কবিতা তমুক কবিতার সঙ্গে অমুক কবিতা তমুক কবিতার সাদৃশ্য আছে কি না দেখাটাই প্রভাব-বিচারের আসল কথা নয়। আসল কথা হল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাববস্তুর মধ্যে এমন উপাদানপুঞ্জ লভ্য কি না যেগুলির উৎস-ভূমি পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা বা তদ্দেশীয় সংস্কৃতি। এই উপাদানের জাতিবিচারে মতবিরোধ থাকতে পারে; তাদের মূল্যবিচারে মতের পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। এ বিরোধ সাহিত্যবিচারের অপরিহার্য অঙ্গ। তবু এই জাতি-বিচার হ'য়ে আসছে। এবং না হলে সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাসই রচিত হবে না।

পাশ্চাত্য প্রভাব বলতেই সাধারণত ধ'রে নেওয়া হয় ইউরোপের, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের রোম্যান্টিক যুগের প্রভাব, কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শ যখন থেকে আমাদের মনে লাগতে শুরু করেছে তখনও ওখানে রোম্যান্টিক যুগ শুরু হয় নি এবং আমাদের দেশের প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতেরা বেশী পরিচিত ছিলেন ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকের লেখকদের সঙ্গে আর ওই শতকেরই ফরাসী মনীষীদের সঙ্গে। আর যে দুজন লেখক এখানকার বিদগ্ধরুচি ব্যক্তিদের মনোহরণ করেছিলেন তাঁরা হলেন ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র শেক্সপীয়র আর মিলটন। মধুসূদনের মত সর্বগ্রাসী বৈদগ্ধ্যের অধিকারী আর দু-একজন মাত্র ছিলেন। তাঁরা ব্যতিক্রম। তাঁদের বিহার ছিল ইউরোপের প্রায় সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে। হিন্দু কলেজের পাঠক্রমে শেক্স-পীয়র থেকে অরম্ভ করে বায়রন পর্যন্ত স্থান পেয়েছিলেন। শেলী বা কীটস বা ওয়া-র্ডস্বার্থ তখনও তেমন প্রতিষ্টা পেয়ে ওঠেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—মধুসূদনের মেঘনাদবধ অলোচনাকালে যাকে বলেছেন 'একটা বিদ্রোহের ভাব' 'কালান্তরে' যাকে বলেছেন 'আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' এবং যে বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজের সংস্পর্শেই এসেছিল, সেই বিদ্রোহের মূলে ছিল ইংরেজের সঙ্গে দৈনন্দিন মেলামেশার প্রতিক্রিয়া আর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ দার্শনিক, রাষ্ট্রনৈতিকদের লেখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচয়। আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের আলোড়ন এই পরিচয়কে বিস্তৃততর করল। Locke এবং Hume-এর সঙ্গে এলেন Diderot, Rousseau; এলেন Tom Payne; এল Jefferson, Adams-এর মতবাদ; এলেন Voltaire। এদের প্রভাব যে কি প্রভূত হয়ে উঠেছিল তা Derozio এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের Academic Association-এর কার্যকলাপ থেকেই স্পষ্ট। এই বিদ্রোহ যে ছিল হিন্দু সমাজের অন্ধ নির্বিচার আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সে কথা ঠিক কিন্তু ঐখানেই তার শেষ নয়। যে সমাজ-ব্যবস্থা ঐ বিধিনিষেধ আচারকেই চূড়ান্ত মূল্য দেয় প্রধানত সেই সমাজেরই বিরুদ্ধে। সেই সমাজজীবনে যে জিনিসের অনুপস্থিতি নবীন উন্মীলিত-চক্ষু বাঙালীর কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল সে হল ব্যক্তিস্বাধীনতার আত্যন্তিক অভাব এবং তারই আনুষঙ্গিক হিসেবে স্ত্রীপুরুষ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজের হৃদয়-হীন প্রথা-দাসত্বের তলায় ব্যক্তি-মানসের নিষ্পেষণ। রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষকেন্দ্রিক জীবনদর্শন ভগবৎ-কেন্দ্রিক জীবনদর্শনের স্থান গ্রহণ করছিল ইউরোপে, এবং নারী, পুরুষের চোখে জীবনবৈচিত্র্যের সারভূতা ব'লে প্রতিভাত হচ্ছিল, সেই

জীবনদর্শনের উল্লাসোন্মাদনার এদেশে প্রথম তরঙ্গভঙ্গ মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য'—রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'র আদি রূপ। পুরুষের প্রাণে নারীর এই যে নবীন উন্মেষ—এ জিনিস প্রাচ্যভূমির বা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বা জীবনচর্যায় কোথায় ছিল?

রবীন্দ্রনাথের ওপরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সামগ্রিক রূপটির আলোচনার মধ্যে আপাতত না গিয়ে সেই প্রভাবের এই একটিমাত্র উপাদানের বহুবিচিত্র রাবীন্দ্রিক বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করা যাক, একটিমাত্র কবিতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে কবিতাটি 'উর্বশী'।

রেনেসাঁস যুগে ইংলণ্ডে নারী যেমন 'Every creature's best' দিয়ে নির্মিত, তার প্রকাশ-অরুণিমায় পুরুষের হৃদাকাশ আরক্তচ্ছটা, সেই যেমন পুরুষের জীবনের সর্বসুখের আকর তেমনি সে আবার সকল দুঃখ এবং তিক্ততারও মূল। প্রেম যেমন 'a pearl, richer than all her tribe' নারী তেমনি

I grant I never saw a goddess go ;
My mistress when she walks treads on the Earth.
(Shakespeare)

প্রেম হল

A bliss in proof, and prov'd, a very woe,
Before, a joy propos'd ; behind, a dream.
All this the world well knows, yet none knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.
(Shakespeare)

রেনেসাঁস প্রেমে স্বর্গ আর নরকের অভূতপূর্ব সংশ্লেষ—মানুষী নারীর এই পরিচয়, মনে হয়, ভাবালুতার লেশবর্জিত—এ যেন জেনেশুনে গলায় ফাঁস লাগানো :

When my love swears that she is made of truth,
I do believe her though I know she lies. (Shakespeare)

কেন? কারণ

In faith I do dot love thee with mine eyes
For they in thee a thousand errors note ;
But 'tis my heart that loves what they despise,
Who in despite of view is pleased to dote.........
(Shakespeare)

কিন্তু এই তিক্ততা কতখানি আন্তরিক আর কতখানি লীলাচ্ছলে আরোপিত তা স্থির করা শক্ত ব'লেই এ তিক্ততা কাল্পনিক নয়, এও নারীর অমেয় চরিত্রের রহস্যময় আলোকবিচ্ছুরণ। এর বিপরীতেই রয়েছে সেই নারী—

Age cannot wither her, nor custom stale
Her infinite variety : other women cloy
The appetites they feed, but she makes hungry
Where most she satisfies. For vilest things
Become themselves in her, that the holy priests
Bless her, when she is riggish

(Shakespeare)

তবু সেই নারী একান্ত বিনয়ে বলে :
"No more but e'en a woman, and commanded
By such poor passion as the maid that milks,
And does the meanest chares. (Shakespeare)

কিন্তু সেও স্পর্ধাভরে সব শঙ্কা পরিহার ক'রে ব'লে ওঠে :
"But what talk we of fathers, when there is such a man as Orlando ?" (Shakespeare)

এবং আপনার প্রেমের গর্বে আপনি মহীয়সী হ'য়ে ওঠে :
My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep ; the more I give to thee
The more I love, for both are infinite. (Shakespeare)

আবার নায়ককে দেবতা বানাতে সেও কম যায় না। নায়ককে অন্যকিছুর নামে শপথ গ্রহণে বাধা দিয়ে নায়িকা আদেশ করে :
Do not swear at all,
Or if thou wilt, swear by thy gracious self,
Which is the God of my idolatry,
And I 'll believe thee. (Shakespeare)

নারীপ্রেমকে প্রাজ্ঞ কর্মোদ্যোগী পুরুষের পক্ষে অশ্রদ্ধেয় স্বীকার ক'রেও, এবং প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাস যে বলেছিলেন, "We are a sufficiently large theatre one for another", সে কথাও যে তাঁর কালে প্রযোজ্য নয় তা দেখিয়ে, Bacon নারী আর প্রেম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

"It is a poor saying of Epicurus, Satis magnum alter alteri theatrum sumus ; as if a man, made for the contemplation of heaven and all noble objects, should do nothing but kneel before a little idol, and make himself a subject, though not of the mouth (as beasts are), yet of the eye, which was given him for higher purposes. It is a strange thing to note the excess of this passion, and how it braves the nature and value of things, by this; that the speaking in a perpetual hyperbole is comely in nothing but love." ১

Epicurus-এর যুগে নারীকে idol বানানো হয়নি, Bacon-এর যুগে হয়েছে এবং সে বিষয়ে Bacon-এর আপত্তি এবং ব্যঙ্গ শুধু তাৎকালিক জীবনসত্যের বিরোধমুখী স্বীকরণ। মানুষ পশুও নয় পরীও নয়, দুইয়ে মিলিয়ে মানুষ। সেই মানুষকেই রেনেসাঁস যুগ আবিষ্কার করেছে। যারা অতিমানুষ হতে চায় তাদের সম্পর্কে Montaigne বলেছেন : "They want to get out of themselves and escape from the man. That is madness : instead of changing into angels they change into beasts, intsead of raising themselves, they lower themselves. The transcendental humour frightens me." ২

নারীর ব্যক্তিত্বের এই স্বীকৃতি, তাকে অর্জন করবার প্রয়োজনীয়তা, হৃদয়ের ক্ষেত্রে তার অধিকারকে পুরুষের সঙ্গে সমান ক'রে দেখা এবং শেষ পর্যন্ত তাকেই পুরুষের জীবনচর্যার কেন্দ্র হিসেবে দেখা—রেনেসাঁস যুগের এই যে বৈশিষ্ট্য এবং যা বাঙালী মনে পাশ্চাত্ত্যভাবধারার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চারিত হচ্ছিল—এ জিনিস প্রাক্-মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে কোথায় ছিল? 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র অস্পষ্ট রূপরেখা থেকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলাতে এসে আমরা এর দৃঢ়রেখ, সবল স্বীকৃতি পাচ্ছি। নারীর প্রতি এই মনোভাব ভারতীয় সাহিত্যে তখন পর্যন্ত

অপ্রাপ্য ছিল এবং অপ্রাপ্য থাকার কারণও ছিল তার গতানুগতিক, পরিবর্তনবিমুখ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে নিহিত। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজে প্রতিষ্ঠাবতী বারাঙ্গনা আছে (বসন্তসেনা থেকে আরম্ভ ক'রে মেঘদূতের বারবিলাসিনীরা পর্যন্ত। প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, চীনীয় সাহিত্যেও তেমনি), পুরুষের কামনার প্রতীক্ষায় কালকাটানো কুমারী আছে, বহুবল্লভের বহুবল্লভা আছে কিন্তু স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ নারী নেই। এ মন্তব্যে কোন নিন্দার ইঙ্গিত নেই। এ শুধু সত্যের স্বীকরণ। যে নারীরা আছেন ভারতীয় সাহিত্যে তাঁরা ভারতীয় পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের অধিকারিণী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা কেউই, এমন কি হৃদয়ের ক্ষেত্রেও, স্বাধীনা নন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে উপন্যাসখানিতে আদিরসের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ঘটেছে সেখানি হল 'কাদম্বরী'। সেখানে পত্রলেখা তো 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। মহাশ্বেতা আর কাদম্বরী, পুণ্ডরীক আর চন্দ্রাপীড়—এঁদের কেউই ব্যক্তি অর্থে চরিত্র নন এবং গন্ধর্বকন্যা হিসেবে মহাশ্বেতা বা কাদম্বরীর যেটুকু স্বাধীনতা ছিল পত্রলেখা মানবী (অন্তত ঐ জন্মে) ব'লে তার সেটুকু ছিল না। মহাশ্বেতা আর কাদম্বরী উভয়েরই তারা-মৈত্রক ঘটেছিল পুণ্ডরীক আর চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে। তার পরে তাদের প্রেমব্যাপার শাস্ত্রসম্মত, গতানুগতিক। প্রেম ছাড়া তাঁদের জীবনে আর কিছু নেই এবং সে প্রেমও কামশাস্ত্রানুমোদিত পথে চলে। স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বরাট্ নরনারীর বিরহ-মিলনব্যাপার এ নয়। মাঝখানে জয়দেবকে ছেড়ে দিলে বৈষ্ণব পদাবলীতে এসেও আমরা যা খুঁজছি তা পাই না। তবে পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত, নারীর ব্যক্তিমূল্যে আস্থাবান এবং প্রেমের আস্বাদনে স্বর্গাভিলাষী নব্য বাঙালী এই বৈষ্ণব পদাবলীতে এক পরম অবৈষ্ণব রসের সন্ধান পেয়েছেন। সেটি হল বৈষ্ণব পদাবলীর 'বৈষ্ণব' মধুর রসকে মানুষী স্তরে নামিয়ে এনে তার উদ্‌গারে মানুষী প্রেমের ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। কেন না একটিমাত্র দুর্বার আবেগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী পৃথিবীতে বোধ হয় অদ্বিতীয়। নূতন বাঙালী সেই ভাবেই ঐ পদাবলীকে নিয়েছিল এবং এখনও নেয় কিন্তু সে পদাবলীতে নারী শুধু নির্বিশেষ পরকীয়া, আর কিছু নয়। মঙ্গলকাব্যের কথা এই সূত্রে বোধ হয় উল্লেখ না করলেও চলে। অন্যপক্ষে তাৎকালিক বাঙালী সমাজে নারীর স্থানকে বর্তমানে কেউই হিংসা করবে না। কুলীনপ্রথা, বহুবিবাহ, পুরুষের পক্ষে একনিষ্ঠার সামাজিক অপ্রয়োজনীয়তা, নারীরই কেবল-সতীত্ব, বিধবার গলগ্রহত্ব অথবা সতীদাহ—এ সবই চূড়ান্তভাবে

প্রমাণ করে নারীর শুধু অধিকারহীনতাই নয়, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তার একান্ত অস্বীকৃতি। এই অবস্থায় পুরুষের অধোগমনও অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবেশ থেকে এবং পূর্বে আলোচিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে, হঠাৎ ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, বিচিত্ররূপিণী নারী বেরিয়ে আসতে পারত না, যদি না পাশ্চাত্ত্যের রেনেসাঁসের ও democracyর উত্তুঙ্গ বীচিমালা এসে আছড়ে না পড়ত এই সুদূর প্রাচ্যের প্রায় প্রস্তরীভূত মানসলোকে। মধুসূদন, বিহারীলাল, সুরেন মজুমদার প্রভৃতি বাঙ্‌ময় হ'য়ে উঠলেন নারীস্তুতিতে। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাবর্ষণে পুষ্ট, এবং তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই সেই ধারার অনুশীলনব্রতী শুধু তিনি নন, তাঁর সমগ্র পরিবার।

কিন্তু মধুসূদনে যে নারীস্তব, নারীর যে দেবীকরণ (divinisation), রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সেখানে থামলেন না, কেন না তিনি শেলী, কীটস, ওয়ার্ডস্বার্থ, Hugo, Lamartine, Nerval, Musset, Gautier এবং সম্ভবত Baudlaire-এর রসেও সিঞ্চিত হয়েছেন, অর্থাৎ রেনেসাঁস ভাবধারা এবং Philosophy of Enlightenment-এর উপরে তাঁর মানসভোজে এসে জুটেছে Romantic ভাবগঙ্গার ধারাগুলি। Romanticism-এর যতগুলি বৈশিষ্ট্য তারক সেন মহাশয় উল্লেখ ক'রে তাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন সেগুলি সবই Romanticism-এর স্থূল কথা। উনিশ শতকী রোম্যান্টিসিজমের মূল কথা হল হৃদয়াবেগের পরম মূল্যে বিশ্বাস :

"The extreme romantic emancipation of the imagination was accompained by an equally extreme emancipattion of the emotions...The romanticist's programme amounts in practice to the indulgence of infinite indeterminate desire, to an endless and aimless vagabondage of the emotions (এখানে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' স্মরণীয়) with the imagination as their free accomplice" (*Rousseau and Romanticism*—Irving Babbitt).[৩] সেই জন্য রেনেসাঁসের বলিষ্ঠ, রক্ত-মাংসের নারীকে ভিত্তি-করা, প্রেম romantic যুগে রূপান্তরিত হল কল্পনা-সর্বস্ব, ভাবালু, আত্মকেন্দ্রিক নারী-রমণ-বিলাসে। তাতে যে দেহ ছিল না তা নয়—খুব বেশী ক'রেই ছিল কিন্তু দেহ-কামনা আবেগের স্বয়ম্ভু মূল্যে ভর ক'রে, আর লক্ষ্যহীন কল্পনার পাল তুলে, প্রেমিককে যেন 'দেহ-হীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে'র'লোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিত : "The love of Rousseau is associa-

ted not...with the intellect, but with the emotions, and so he substitutes for a 'wire-drawn and super-subtilized gallantry,' the ground-swell of elemental passion...Spirit is pressed into the service of sense in such wise as to give to sense a sort of infinitude. Baudelaire pays his homage to a Parisian grisette in the form of a Latin cantile to the Virgin...For though the romanticist wishes to abandon himself to the rapture of love, he does not wish to transcend his own ego. The object with which Pygmalion is in love is after all only a projection of his own 'genius'. But such an object is not in any proper sense an object at all. There is in fact no object in the romantic universe—only subject. This subjective love amounts in practice to a use of the imagination to enhance emotional intoxication, or if one prefers, to the pursuit of illusion for its own sake." (ঐ)[৪] প্রিয়ার এই 'অমৃত মূরতি' ধ্যান, নারীর এই দেবীপদ-প্রাপ্তি, মানবীর আধারে হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে এই রূপ হল পুরুষের বাসনানিচয়ের নির্যাসময় মূর্তি—এই মূর্তির পরিপূর্ণ বিকাশ রোম্যান্টিক চেতনায়। সে মানস-সুন্দরী। কবি হঠাৎ তার স্বপ্ন থেকে উঠে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে ঃ

"I arise from dreams of thee...
The wandering airs they faint
On the dark, the silent stream—
The champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream ;...
O lift me from the grass !
I die ! I faint ! I fail !"

কিন্তু কবির বাসনাময় এই যে মূর্তি এতে প্রবৃত্তির পূতিগন্ধ একেবারেই নেই, কেন না এই বাসনার নির্বাধ প্রকাশ এবং স্বীকরণই রোম্যান্টিক দর্শনের মূল কথা। 'Man in the state of nature' হল দেবতুল্য। তার যা কিছু মলিন সবই

সমাজের কলুষলেপন। এই যে Naturalistic morality, ইংলণ্ডে তৎকালে এর প্রবক্তা হচ্ছেন Shaftesbury এবং Hutcheson। তাঁরা The Good ও The Beautiful, শিব আর সুন্দরের সমীকরণ করেন—অস্বীকার করেন মানুষের মধ্যেকার প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির, পশুর আর দেবতার চিরন্তন দ্বন্দ্ব। আমাদের প্রাচ্য ঐতিহ্যে চিরকালই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। অদ্বৈতম্-এর সঙ্গে সুন্দরম্‌কে আমরা যোগ করতে শুরু করেছি অবশ্য উপনিষদের যুগেই, কিন্তু সুন্দরের স্বাতন্ত্র্য শুরু হয়েছে ভাগবতের যুগ থেকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব উজ্জ্বলনীলমণি-র আমল থেকে। কিন্তু সে তো বৈষ্ণব সাধনার উচ্চতম পর্যায়ে, সাধারণ স্থূল মানবীয় স্তরে নয়। স্থূলে শিব আর সুন্দর এক ছিল না—এক হল পাশ্চাত্ত্যের রোম্যাণ্টিক দর্শনে : "The assertion of man's natural goodness is plainly something very fundamental in Rousseau, but there is something still more fundamental, and that is the shifting of dualism itself, the virtual denial of a struggle between good and evil in the breast of the individual. That deep inner cleft in man's being on which religion has always put so much emphasis is not genuine. Only get away from an artificial society and back to nature and the inner conflict which is but a part of the artificiality will give way to *beauty and harmony*...Diderot puts the underlying thesis of the new morality more clearly than Rousseau : 'Do you wish to know in brief the tale of almost all our woe?' There once existed a natural mán ; there has been introduced within this man an artificial man and there has arisen in the cave a civil war which lasts throughout life." (Ibid)[৫] এই তত্ত্বের প্রভাব এত সফল হয়েছিল এখানে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ পর্যন্ত করেছিলেন ফরাসী দার্শনিক বিক্তর কুজ্যাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : নাম দিয়েছিলেন—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। তাই মানুষের বাসনা হল বিকশিত কমলের মত সুন্দর আর সেই কমলে আলগোছে পা দুটি রেখে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষের হৃদয়সম্ভূতা মোহিনী নারী :

...বিকশিত বিশ্ববাসনার

অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

উর্বশী স্বর্বেশ্যা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে প্রিয়োত্তমা। বেশ্যার এই উন্নয়ন রোম্যান্টিক চেতনাতেই সম্ভব কারণ মানুষ যেহেতু স্ব-স্বভাবে সর্বমালিন্যশূন্য তাই বেশ্যার বেশ্যাত্ব একটি আপতিক গুণমাত্র—সমাজের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার ফল। সেই সমাজের পাপ নারীর স্বর্গীয়তাকে অপনীত করতে পারে না। কবি সেই আপতিক কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে উর্বশীকে তুলে ধরলেন :

নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ

সে কি নয় তাই জানিয়ে দিয়ে। তার সঙ্গে মর্ত্যজনের যে সম্পর্ক কবি কল্পনা করছেন সেটি সমাজবহির্ভূত। সমাজ পুরুষের সঙ্গে নারীর তিনটি সম্পর্ক স্বীকার করে—মাতৃত্ব, দুহিতৃত্ব এবং বধূত্ব। এতদতিরিক্ত কোন সম্পর্ককে সে কল্যাণকর ব'লে মনে করে না। অথচ এই তিনটি সম্পর্কের মধ্যে মানসীকে ধরা যায় না। মানসী সেই, যে গতানুগতিক রীতিতে জীবযাত্রাপালনে সহায়তা করে না, যে পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে, নাচিয়ে তোলে, হঠাৎ আলোর ঝলকে তার অন্তস্তল পর্যন্ত উদ্ভাসিত ক'রে ব'লে ওঠে 'তুমি অসামান্য'। অসামান্যকে সমাজ ভয় পায়, অস্বীকার করে। আর যে নারী এমনি ক'রে পুরুষের সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে তার স্বাভাবিক (Natural Self) অকলঙ্ক সত্তাকে জাগ্রত করে দুর্দম গতিবেগে, তাকেও সমাজ পরিহার করে। কিন্তু তাকেই রোম্যান্টিক চেতনা খুঁজে বেড়ায় :

"In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought....
When like a noonday dawn, there shone again
Deliverance. One stood on my path who seemed
As like the glorious shape which I had dreamed
As is the Moon". —Shelley

রবীন্দ্রনাথ :

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

সে হঠাৎ দেখা দেয়। পূরবীর "আহ্বান" কবিতায় এই মানসী এসেছে অনেক

রূপবিবর্তনের পরে। সে কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু এই Eternal Feminine বা 'Unexpressive She'কে সামাজিক বাঁধনে বাঁধা যায় না ব'লেই সে মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, তবু রবীন্দ্রনাথ তাকে আমাদের মানসলোকে অবতারিত করলেন পরম দুঃসাহসে। মধুসূদনের 'তিলোত্তমা'য় যে আভাসিত সে-ই উর্বশীতে পূর্ণ বিকশিত। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ—একটি অব্যাহত ধারা প্রবাহিত হ'য়ে উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠল রবীন্দ্রনাথে—পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক ভাবপ্লাবনের পূর্ণ আত্তীকরণে।

॥ ২ ॥

কারও কারও মনে হ'তে পারে উর্বশীর ঐ ভাবকল্পের জন্যে প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক চেতনার দরজায় ধর্ণা দেওয়ার কি দরকার। দরকার হত না যদি রবীন্দ্রনাথের উর্বশী পূর্বতন প্রাচীন উর্বশীর অনুবৃত্তি মাত্র হত। কিন্তু বিশ্লেষণ-মুখে ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যেগুলির মূলই শুধু নয়, কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত প্রতীচ্য-জাত ও প্রতীচ্য-পরিবর্ধিত। সনাতনী নারী নবতনী হয়ে প্রতীচ্য-মানসে আবির্ভূত হ'য়ে কেমন ক'রে বাংলাদেশের উনিশ শতকী ভাব-বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র-মানসে অধিষ্ঠিত হল এবং মাতা কন্যা বা বধূ না হ'য়ে বিকসিত বিশ্ব-বাসনার কমলদলবিহারিণী, পুরুষের অপ্রাপণীয়া, লীলৈকসর্বস্বা হ'য়ে উঠল তা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে যে উর্বশীকে পাওয়া যায় তার পরিপূর্ণ রূপ কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে প্রাপ্য। উর্বশী উপাখ্যানের মূল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, এবং পরবর্তী শতপথব্রাহ্মণে তারই বিস্তারিত রূপ। বিষ্ণু-পুরাণেও এ কাহিনী আছে। অবশ্য স্থানভেদে খুঁটিনাটির পার্থক্য তো থাকবেই। তা সত্ত্বেও মূল উপাখ্যানটির মূল কথা হল অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গে মানুষ পুরূরবার সাময়িক মিলনের পর চির-বিচ্ছেদ। কালিদাস সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী বিয়োগান্ত সমাপ্তিকে মিলনান্তক করেছেন। তাই বিক্রমোর্বশী নাটকের মূল তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের তত্ত্বেরই অনুসারী—স্থূল স্তরে নর-নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিতে যে সম্পর্কের আরম্ভ, সেই সম্পর্কের দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি ও আবেগহীন অভ্যাসে যার পরিসমাপ্তি—তার সার্থক মানবীয় স্তরে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বেদনার মধ্যে দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক স্থূল ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির অন্তঃসারশূন্যতার উপলব্ধি। সকলের জীবনে এই উন্নয়ন ঘটে না। তাই প্রেমের নামে জীবনে ও সাহিত্যে যা চলে তা হল অভিজ্ঞানশকুন্তলের শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান পর্ব পর্যন্ত বা বিক্রমোর্বশীয়ের পরিস্থিতির মানবীয় স্তরে পুনরাবৃত্তি। ভাগ্যে সরকারী আইন আর সামাজিক শাসন আছে। তা না হলে ঐ প্রত্যাখ্যান আর পুনর্গ্রহণে পরিণত হত না। বিক্রমোর্বশীয় নাটকে শকুন্তলার গভীরতা ও কাব্যসৌন্দর্যের অভাব তো আছে বটেই, উপরন্তু দেহ এখানে শেষ পর্যন্ত দেহ-সর্বস্বতায় পর্যবসিত। শকুন্তলায় যেখানে সর্বদমনের আবির্ভাব প্রেমের পরিণাম ও সিদ্ধির প্রতীক, বিক্রমোর্বশীয়তে সেখানে উর্বশী আপন সন্তান আয়ুকে ঋষির আশ্রমে লুকিয়ে রেখে পুরূরবার সঙ্গ-সুখ

ভোগ ক'রে চলেছে—কেন না, সন্তানমুখ রাজা দর্শন করলেই উর্বশী শাপমুক্ত হ'য়ে স্বর্গে প্রতিগমন করবে। সে নিজেই বলছে: "তদো মএ মহারাঅ-বিওঅভীরুদাএ চির-আল-সঙ্গমণিমিত্তং ভঅবদো চবণস্স অস্সমপদে পুত্তও অজ্জাএ সচ্চবদীএ হথে অপপণা ণিকৃখিত্তো…।" অপ্সরা উর্বশীর বিপ্রতীপ হলেন মানবী পুরূরবা-পত্নী। তিনি 'প্রিয়প্রসাদন' ব্রত ক'রে স্বামীর ওপর নিজের কেবলাধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে গেলেন স্বামীর কল্যাণের জন্যে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে অপ্সরা উর্বশীর জয় আর মানবীর পরাজয়। সুন্দরী নারীতে পুরুষের সন্তানোৎপাদন আকাঙ্ক্ষা বা নারীর স্থির যৌবনের উপভোগের কামনাই বিক্রমোর্বশীয় নাটকের মোদ্দা কথা। অপ্সরার অবতারণা ক'রে কালিদাস পুরুষের এই তৃপ্তিহীন কামকলাবিলাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। পাছে আমরা এতটুকু ভুল বুঝি এই আশঙ্কায় কালিদাস উর্বশীর কাছ থেকে পুরূরবার বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন পুরূরবার উর্বশী-নিষ্ঠার অভাব। উর্বশীর সঙ্গে গন্ধমাদন অঞ্চলে বিহার-রত অবস্থায় পুরূরবা সকাম দৃষ্টিক্ষেপ করেন উদকবতী নামে এক বিদ্যাধর-কন্যকার দিকে। তাতে কোপাবিষ্ট উর্বশী কুমারবনে প্রবেশ ক'রে লতায় রূপান্তরিত হন। পরে যথারীতি পুরূরবার বিরহ-আর্তি শুরু হয়। একান্তভাবে দেহাত্মক এই যে নর-নারী-সম্পর্ক, এ জিনিস ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও রোম্যান্টিক ভাবধারায় পরিশোধিত ও উন্নমিত হ'য়ে ওদেশে এবং এদেশে মূলত একটি আত্মিক সম্পর্কে পর্যবসিত হয়েছে—নারী মানসী হয়েছে, আবার রোম্যান্টিক আত্মকেন্দ্রিক ভাবালুতায় সে হয়েছে অধরা, অনির্বচনীয়া, মানসী। এ জিনিস ভারতচন্দ্রে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না জয়দেবে। আর শকুন্তলা এই মানসসুন্দরীর আদর্শ থেকে বহু দূরে। সীমায়িত শকুন্তলার মধ্যেই, শেষের স্তরে, দুষ্মন্তের অসীম তৃপ্তি। এ হল ক্ল্যাসিকাল মনোভাব।

তবু আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন যে, ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে এই নিছক যৌন আবেগ অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সেখানে উর্বশী শুধু চিরযৌবনা চিরোপভোগ্যা নারী নন, তিনি পুরুষের জীবনসর্বস্ব, তিনি যেন জীবনের পরম সত্যের মূর্ত প্রতীক। তাই রবীন্দ্রনাথের ঋণ কালিদাসের কাছে তত নয়, যত বৈদিক মূল কাহিনীর কাছে:

"প্রাচীন আর্য জগতের আখ্যানটির মৌলিক সরলতা ও মনোহারিতা বিষ্ণুপুরাণে কথিত গদ্যময় উপাখ্যান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে কালিদাসের নাটকে, তথা অন্য পুরাণে, এই উপাখ্যান বহুশঃ পরিবর্তিত ও

পরিবর্ধিত হইয়া নিতান্ত অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' পর্যায়ের কাব্য-সর্জনার মধ্যে, বৈদিক উর্বশীর কল্পনা একটি মূল সূত্র রূপে বিদ্যমান। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে কতকগুলি বাক্য আছে, যেগুলিতে উর্বশীকে সামান্য একটি রূপকথার নায়িকার পদ হইতে মানুষের কামনার কেন্দ্রীভূত এক বিশ্বাবেশিনী নারী-রূপিণী সত্তা বা শক্তিতে পরিণত করিতেছে। এই সত্তাকে মানুষ পাইয়াও পাইতেছে না—অমানুষী এই শক্তিকে মানুষ সেবা করিয়াছে, লাভ করিয়াছে, (পুরূরবো অনু তে কেতমায়ং ; রাজা মে, বীর। তূন্বস্ তদাসীঃ অমানুষীষু মানুষো নি সেবে); কিন্তু এই শক্তি বা সত্তা এখন প্রথম উষার ন্যায় চিরতরে অন্তর্হিত, বায়ুর ন্যায় দুরাপণীয় (প্রাক্রমিষম্ উষসাম্ অগ্রিয়েব…দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি)। কিন্তু তবু আশা মনের কোণে জাগিয়া থাকে; উর্বশী একবার দেখা দিয়া আবার চলিয়া যাইতেছেন, পুরূরবার আকুল কামনা—

অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীম্
উপ শিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ ;
নি বর্তস্ব—হৃদয়ং তপ্যতে মে।

[অত্যন্ত কামনাযুক্ত হইয়া আমি উর্বশীকে আহ্বান করি—যে উর্বশী অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখে ও আকাশ-মার্গকে পরিমাণ করে। আমার সমস্ত সুকৃতের বা পুণ্যকর্মের ফল তোমাতেই পঁহুছাক ; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় তপ্ত হইতেছে।]

এই পুরূরবা-উর্বশীর ঋক্‌গুলির মধ্যে, বিশেষ করিয়া উপরের উদ্ধৃত ঋক্‌টিতে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মহীয়সী কল্পনার কতকগুলি বীজ যেন বিদ্যমান।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের উর্বশী-পুরূরবা সংবাদময় পঁচানব্বইয়ের সূক্তে উদ্ধৃত এই সতেরোর সংখ্যক উপান্ত ঋক্‌টিতে, অমানুষীর সহিত মানুষের প্রেমের কাহিনী বা রূপকথাটি, সাধারণ পার্থিব সত্তা বা জীবনের ঊর্ধ্বে একেবারে অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত হইতেছে। এখানে, এমন কি মানুষের নৈতিক জীবনের সার্থকতা হইতেছে, জীবনের পিছনে অবস্থিত শাশ্বত সত্তাতে তাহার সমস্ত কর্ম-চেষ্টা, সমস্ত শুভকার্য, সব সুকৃতের সমর্পণের মধ্যেই—উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ —এরূপ ইঙ্গিতও রহিয়াছে।"

সুনীতিকুমার বৈদিক ঋক্‌গুলিকে যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে গ্রহণ করলেও, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' আর 'উর্বশী' ভাবকল্পের উৎস যে এক, বা

এই দুই ভাবকল্পের মধ্যে কোন মৌলিক ঐক্য আছে, এ কথা স্বীকার করলে 'জীবনদেবতা'-পর্বের কবিতাগুচ্ছ পাঠের ফলশ্রুতি আর 'উর্বশী' কবিতা-পাঠের ফলশ্রুতির মধ্যে দুস্তর পার্থক্যের ব্যাখ্যা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সে কথা ছেড়ে দিলেও বৈদিক ঋক্‌গুলির যে গূঢ়ার্থ সুনীতিকুমার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তা গ্রহণের পথেও অনেক বাধা। ঐ ঋক্‌গুলির উদ্গাতা নিশ্চয়ই সমাজে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে বা নারী এবং পুরুষের জীবনে সার্থকতার সর্বাঙ্গীণ সমতা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। পুরুষ-প্রধান বৈদিক সমাজে নারীর স্থান এমনিতেই পুরুষের নীচে ছিল ; অন্‌-আর্য আদিবাসী সৈন্ধবদের সঙ্গে, হয়তো বা দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে, গৃহাভ্যন্তরে নারীর অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু গতানুগতিক সেই বাক্, অপালা বা দেবীসূক্তের নারী-ঋষির নামকীর্তন ক'রে এ কথা প্রমাণ করা যাবে না যে নারীকে সত্যিই বৈদিক যুগের পুরুষ পুরুষের সমতুল্য বা পুরুষের জীবনে সর্বমঙ্গলা আরাধ্যা ব'লে মনে করত। তবে অপ্সরার কথা আলাদা। সে তো আর মানবী নয়। মানবী-কলুষ-স্পর্শহীন অপ্সরার সংসর্গ পুরুষের মান-লাঘব ঘটাবে না ; বরং তা অমানুষী (ঋকের কথাটি এখানে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়) অনুরাগ বলে মানবীয় বিধি-বহির্ভূত। স্বেচ্ছাচারিণী উর্বশী বা অন্য অপ্সরারা তখন মাঠে-ঘাটে প্রাপণীয়া—ওই গ্রীক নায়াড বা ড্রায়াডদের মত। জিউস বা পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভে ইন্দ্র পার্থিবাতে আসক্ত হতেন। বৈদিক যুগের মানুষ দেবতা বা অপ্সরাদের সংসর্গ হামেশাই লাভ করতেন। এবং সেই যুগে যখন তাঁরা মেঘ-থেকে-পড়া জলকে দ্যুলোক-গাভীকে দোহন-করা দুধ ব'লে উল্লসিত হ'য়ে উঠতেন এবং সেই দ্যৌঃ (Zeus) আর পৃথিবীর মিলন প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন দিগন্তে অভ্ররাগে, তখন যে কোন নিতান্ত জৈবিক আবেগও আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে বহির্বিশ্বকে একেবারে মনোময় ক'রে তুলত। তখন বৃক্ষ, পাথর, ধূম, অগ্নি সবই চৈতন্যময়। এই মানসিক প্রক্ষেপণ যে আদিম যুগে মানুষের মানসক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা আজ বিজ্ঞানে স্বীকৃত : "Primitive man is not much interested in objective explanations of the obvious, but he has an imperative need—or, rather, his unconscious psyche has an irresistible urge—to assimilate all outer sense experiences to inner, psychic events. It is not enough for the primitive to see the sun rise and set ; this external observation must at the

same time be a psychic happening: the sun in its course must represent the fate of a god or hero who, in the last analysis, dwells nowhere except in the soul of man. [C. G. Jung: *Collected Works*, Vol. IX, Part 1, p. 6]"৬

যে স্বৈরিণী অপ্সরা বৈদিক যুগে পুরুষকে স্বেচ্ছায় বরণ করত তাকে, পৌরাণিক যুগে বা বৈদিক যুগের শেষ স্তরেই, (নারীকে অবাধ সম্ভোগের পথে উত্তরোত্তর নানা বাধা বাড়তে থাকায় হয়ত) স্বাধীনতা হারিয়ে পুরুষের একেবারে অধীন হয়ে ইন্দ্রের সভায় নর্তকী হ'তে হল। অপ্সরা হল বেশ্যা; পুণ্যবলে মানুষ স্বর্গে গেলে তাকে উপভোগ করতে পারে। তৎকালের সমাজে অবশ্য বেশ্যার প্রতি মনোভাব সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে 'একনিষ্ঠার' আত্যন্তিক মূল্য স্বীকৃতির ফলে এবং নারীর ব্যক্তিমূল্য পুরুষের ব্যক্তিমূল্যের সমকক্ষতা অর্জন করায় বেশ্যা নীতিগতভাবে ঘৃণ্য হয়ে উঠল কিন্তু বাস্তবজীবনে তার আসন হল অটল। উপায় নেই। সমাজ-জীবনের সমস্ত কলুষের ভার বহন ক'রে সে গার্হস্থ্য-জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করল। এই উপলব্ধির ফলে, রোম্যান্টিক ভাবালুতার আবেগে, বেশ্যার অবশ্যম্ভাবী মানসিক স্থূলতাকে অস্বীকার করার, তাকে সমাজ-নিপীড়িতা হিসেবে হৃদয়ের সমস্ত করুণা দান করার, এমন কি তাকে মানুষ হিসেবে মহৎ বলে দেখার প্রবণতা দেখা দিল। ফরাসী রোম্যান্টিক ও ন্যাচরালিস্টিক এবং রুষ ন্যাচরালিস্টিক সাহিত্যে এই দেবীভূত বেশ্যার খুব আনাগোনা। বারাঙ্গনার প্রতি এই পরিবর্তিত মনোভাবের দ্যোতক অবশ্য Lecky-র মন্তব্য:

"That unhappy being whose very name is a shame to speak; who counterfeits with a cold heart the transports of affection, and submits herself as the passive instrument of lust; who is scorned and insulted as the vilest of her sex, and doomed for the most part to disease and abject wretchedness and an early death, appears in every age as the perpetual symbol of the degradation and the sinfulness of man. Herself the supreme type of vice, *she is ultimately the most efficient guardian of virtue*. But for her the unchallenged purity of countless happy homes would be polluted, and not a few who, in the pride of their untempted

chastity, think of her with an indignant shudder, would have known the agony of remorse and of despair. On that one degraded and ignoble form are concentrated the passions that have filled the world with shame. *She remains, while creeds and civilisations rise and fall, the eternal priestess of humanity, blasted for the sins of the people.* (*History of European Morals*) [৭]

এর পরে উর্বশীর উন্নয়ন অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না এবং সামাজিক বিবর্তনের ফলে এই মনোভাব স্বষ্ট না হ'লে উর্বশীর এই উদ্‌গতি সম্ভবও হত না। সেই সামজিক বিবর্তনের পীঠভূমি ইউরোপ এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইংলণ্ড।

বৈদিক অপ্সরার প্রতি যে পূজা বা আত্মনিবেদনের প্রকাশ আলোচিত ঋক্‌গুলির এক-আধটিতে রয়েছে তাতে উর্বশীকে আদ্যাশক্তির পর্যায়ে তুলেছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের খ্রীষ্টপূর্ব যুগের পেরিক্লিযান অ্যাথেন্সে বারাঙ্গনাদের সম্পর্কে Lecky-র নিম্নলিখিত মন্তব্যটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি :

"In general, however, the position of the virtuous Greek woman was a very low one...The only women who attracted the notice of the people were the heterae, or courtesans...The Greek conception of excellence was the full and perfect development of humanity in all its organs and functions and without any tinge of asceticism...and the most virtuous men habitually and openly entered into relations which would now be almost universally censured...The voluptuous worship of Aphrodite gave a kind of religious sanction to their profession. Courtesans were the priestesses in her temples...The courtesan was often the queen of beauty. She was the model of the statues of Aphrodite, that commanded the admiration of Greece. Praxiteles was accustomed to reproduce the form of Phryne, and her statue, carved in gold, stood in the temple of Apollo at Delphi ; and when she was accused of corrupting the youth of Athens, her advocate, Hyperides, procured her acquittal by suddenly unveiling her charms before the dazzled eyes of the assembled

judges......Pindar and Simonides sang the praises of courtesans, and grave philosophers made *pilgrimages* to visit them, and their names were known in every city." *(Ibid)* ৮ শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা এই সব গ্রীক মহীয়সীদেরই সমগোত্রীয়া। যে যুগের গ্রীসের অবস্থা Lecky বর্ণনা করলেন, তারও আগে Homeric যুগের যে চিত্র Homer-এর Iliad-এ বা Obyssey-তে আছে তাতে দেবীদের সঙ্গে মানুষের আবার মানবীর সঙ্গে দেবের সম্পর্ক অবাধ। আর একেবারে মানুষী স্তরে তো নরনারীসম্পর্কে একনিষ্ঠা, বা নারীর যৌন মূল্য ভিন্ন আর কিছু স্বীকৃতই ছিল না। আমাদের বৈদিক যুগ আর Homeric যুগের মধ্যে অর্ধ-সহস্রকের বেশী ব্যবধান হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু বৈদিক ঋষির উর্বশী-স্তবের নিকটতম সমান্তরাল পাওয়া যায় রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গঋষির বেশ্যাস্তবে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বিষয় অবলম্বনে 'পতিতা' কবিতা লিখে প্রাচীন কাহিনীর আধুনিক ও রোম্যান্টিক ভাষ্য রচনা করেছেন। এই কবিতাতেই সম্পূর্ণ সূচিত হয়েছে নারীর প্রতি আধুনিক মানুষের মনোভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ঋষ্যশৃঙ্গ বেশ্যাকন্যাকে দেখে যৌন উল্লাসে অধীর হলেন। নারী-মাধুর্য-দর্শনে অনভ্যস্ত ঋষির কোন রক্ষাকবচই ছিল না। তারপরে তিনি পিতা বিভাণ্ডকের কাছে লোমপাদপ্রেরিত বাররমণীর যে বর্ণনা দিলেন তাও একেবারে দেহসর্বস্ব, যৌন ভোগবাসনামুখর। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় এক-আধটি কথাকে আলাদা ক'রে দেখলে ঐ বৈদিক পুরূরবার উর্বশী-ভিত্তিক আদ্যাশক্তির স্তব ব'লে মনে হবে। মহাভারতের বনপর্বে দশরথ ও লোমপাদ রাজার ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে স্ব স্ব রাজ্যে আনার কাহিনী রাজশেখর বসু-কৃত মহাভারতের মূলানুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি:

"বেশ্যাকন্যা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে বলল, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় দেখছি, আপনি আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফলমূল দিয়ে আমি আপনার যথাবিধি সৎকার করব। এই কৃষ্ণাজিনাবৃত সুখাসনে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি দেবতার ন্যায় কোন্ ব্রত আচরণ করছেন?...

"ঋষ্যশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্য মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এলেন।...পুত্রকে বিহ্বল দেখে তিনি বললেন, বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখছি না, তুমি চিন্তামগ্ন, অচেতন ও কাতর

হয়ে আছ কেন? কে এখানে এসেছিল? ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারী এসেছিলেন, তিনি আকারে অধিক দীর্ঘ নয়, খর্বও নয়, তাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তিনি দেবপুত্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর জটা সুদীর্ঘ, নির্মল কৃষ্ণবর্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কি এক বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি রোমহীন অতি মনোহর মাংসপিণ্ড আছে। তাঁর কটি পিপীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ; পরিধেয় চীরবসনের ভিতরে সুবর্ণমেখলা দেখা যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা আছে। তাঁর পরিধেয় অতি অদ্ভুত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সুন্দর, কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়।···সেই দেবপুত্রের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন ক'রে আমার জটা ধ'রে মুখে মুখ ঠেকিয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে আমার হর্ষ হল। ···তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদু জল পান ক'রে আমার অত্যন্ত আনন্দ হল, বোধ হল যেন পৃথিবী ঘুরছে। এই সকল বিচিত্র সুগন্ধ মাল্য তিনি ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আমি অসুখী হয়েছি, আমার গাত্র যেন দগ্ধ হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহ্মচর্য কি প্রকার? আমি তাঁর সঙ্গেই তপস্যা করব।" পরে অবশ্য ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর এই প্রথমা প্রিয়াকে ছেড়ে শান্তাকে বিবাহ করেছিলেন—হয়ত তফাতই বুঝতে পারেন নি। ঋষ্যশৃঙ্গের অতি স্বাভাবিক এই দেহসর্বস্বতা নিশ্চয়ই আধুনিক রবীন্দ্রনাথের "পতিতা"র অনুপ্রেরণার মূল নয়। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটির মূল এক—যেমন প্রাচীন হ্যামলেট গল্পের আর শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের মূল এক। পতিতার সবটুকু যে পতিতা নয়, তার মধ্যে পুরুষের মানসী যে মরে না, ঋষ্যশৃঙ্গের অকুণ্ঠ আরতিতে বেশ্যার সেই সুচিরসুপ্ত ব্যক্তিত্ব জেগে উঠল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণে বারবনিতাকে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে বেদে পুরূরবার উর্বশী-বিষয়ক উক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঋষ্যশৃঙ্গ যা বলেছেন তার থেকে "উর্বশী" কবিতার দূরত্ব দুস্তর নয় একটুও। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' নিজেই বলছে:

যে গাথা গাহিলা সে কখনও আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জন গিরিশিখর পরে।

সত্যিই এর আগে বাংলা ভাষায় রচিত হয় নি। গাথার কিয়দংশ, পার্থক্য স্পষ্টীকরণের জন্য, স্মরণীয় :

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে—
"কোন দেব আজি আনিলে দিবা ?
তোমার পরশ অমৃত সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

এ উক্তি কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের নয়, এ উক্তি ঋষ্যশৃঙ্গের বকলমে রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের। মনে পড়িয়ে দেয় অনেক ইংরেজী-ফরাসী-রুশ কবিতা—She was a phantom of delight থেকে পুশকিনের লুকিয়ে Nereid দেখার আনন্দ পর্যন্ত : Breathless for joy I lay, hid in the olive trees ; কিন্তু মধুসূদনের ছাড়া আর কোন বাঙালী কবির কোন কবিতাকে নয়। মনে পড়ে তিলোত্তমাসম্ভবের সমলোচনায় সে কালের অনেক পণ্ডিত স্বর্বেশ্যা তিলোত্তমাকে সূর্যমণ্ডলে স্থাপনে আপত্তি করেছিলেন, তাঁরা বোঝেন নি এ তিলোত্তমা সে তিলোত্তমা নয়।

সুনীতিকুমারের বৈদিক উর্বশী সম্পর্কে উক্তির সমালোচনা করলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সুনীতিকুমারের দৃষ্টি নিরপেক্ষ—সেখানে সঙ্কীর্ণতা বা একদেশদর্শিতার নামগন্ধ নেই। তিনি 'উর্বশী' কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ওপর বৈদিক প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই বলেছেন, "উর্বশী কবিতার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা হইতেছে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে—প্রাচীন গ্রীক প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী Aphrodite—আফ্রোদিতের কল্পনা হইতে; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, ও তাহার আদর্শে গঠিত আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্যানুভূতি আছে, তাহাও ইহার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা। তৃতীয় অনুপ্রাণনা, আমার মনে হয়, কবি পাইয়াছিলেন, পরোক্ষ ভাবে—সুফী কবিতা হইতে।...উর্বশীর কল্পনার ও উপাখ্যানের মূল কথা—দেবকন্যার সহিত মানবের প্রেম।...আদি-আর্য (বা ইন্দো-ইউরোপীয়) জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এইরূপ এক বা একাধিক myth বা দেবকাহিনী

প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য, প্রাচীন ইরাণীয়, প্রাচীন গ্রীক, ইতালীয়, কেলতিক, জরমানিক ও স্লাব, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সকল শাখার মধ্যেই এই ধরণের উপাখ্যান বা কথা পাওয়া যায়।" সুনীতিকুমার মূল উপাখ্যানেই থেমে গেছেন, তার রূপবিবর্তন বিশ্লেষণ করেন নি আর তারকনাথ সেন মশায় ভারতীয় বেদ-উপনিষদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখ চিত্তকে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন।

॥ ৩ ॥

উর্বশী কবিতার ভাবকল্পে দ্বিতীয় স্তর রচিত হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটিতে :

ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।

যে মানসী সে সুধাময়ী, তার সুধাশ্যামলিমতীরে তৃষ্ণাদীর্ণ মানুষ আসে মরুতীর হ'তে। আসে ; এসে কি সুধা পায় ? রেনেসাঁস চেতনায় নারীকে দেখেছি অমৃতময়ী রূপে, আবার ছলনাময়ী রূপে। সে পুরুষকে মুগ্ধ করে, আবার তীক্ষ্ণ ছলনায় তাকে বিষিয়ে দেয়। রোম্যান্টিক চেতনা নারীকে ভূর্লোক থেকে ভূবর্লোক, সেখান থেকে স্বর্লোক—এমনি ক'রতে ক'রতে একেবারে সত্যলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে বটে; কিন্তু নৈরাশ্যের তীব্রতায় তাকে আবার নামাতে নামাতে রসাতলে নামিয়েছে। এবং রোম্যান্টিকের আদর্শ নারী যেমন অযোনিসম্ভবা, তারই স্বমনসিজ, তার যেমন কোথাও বাস্তব অস্তিত্ব নেই অথচ তারই সন্ধানে আধুনিক ইহপরায়ণ মানুষ, কেউ কল্পনা, কেউ লোহার সিন্দুক উজাড় ক'রে দিচ্ছে, তেমনি ঘৃণার আতিশয্যে সে তাকে তৃণাদপি অধম করেছে। নারীর চরিত্রের রোম্যান্টিক চেতনা-লব্ধ স্ববিরোধের চূড়ান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের এই যে পঙ্‌ক্তিটি—এর পূর্ণতর, তীব্রতর রূপ প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক সাহিত্যে একেবারে যত্রতত্র পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এক মধুসূদনের তিলোত্তমায় অস্পষ্টভাবে ছাড়া আর কোথাও নেই। 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে বৈপরীত্যের কথা বলেছেন সে বৈপরীত্য নারীর মনোহর বৈচিত্র্যের দিগ্‌বিশেষ, সে বৈপরীত্য বিষামৃতের বৈপরীত্য নয়। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিকের এই দাহের হাত এড়াবার জন্যে নারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।...
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।

অর্থাৎ নারীর মহিমা বা মূল্য সচেতন নয়, অচেতন ; যুক্তি বা ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, উপলব্ধি বা অনুপ্রাণনা নির্ভর। তাই তাকে আবিষ্কার ক'রতে হয়। দাও বললেই সে দিতে পারে না।

বোলো তারে আজ—
অন্তরে পেয়েছি বড় লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে প্রিয়তম—
আজি মোর দৈন্য কর ক্ষমা।

কিন্তু এমন অনিশ্চয়তার প্রতীক্ষা যদি বা ভারতীয় ধৈর্যে সম্ভব, প্রতীচ্যের যে রোম্যান্টিসিজ্‌মের বৈশিষ্ট্যই হল অধীরতা এবং আপন প্রবণতামুখে কল্পনাকে অনর্গলিত করা, সেই রোম্যান্টিক চেতনা অমৃতের বদলে, সাধারণ পুরোডাশ প্রাপ্তির সম্ভাবনায়, ক্রোধে, হতাশায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে নারীকে বললে 'তুমি প্রাণঘাতিনী, তুমি বিষকন্যা।' নারী না অমৃত না বিষ, সে দুই-ই, অথবা দুইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, সে পুরুষের মতই মৃন্ময়।[১] প্রতীচ্যের এই তীক্ষ্ণ, অক্ষমায় ভরা, স্ববিরোধের চেতনাই রবীন্দ্রনাথকে, পৌরাণিক উর্বশী থেকে বিষামৃতবাহিনী উর্বশীকে সৃষ্টি করিয়েছে।[২] পুরাণে বর্ণিত উর্বশীর হস্তদ্বয়ে কোনকালেই অমৃত বা হলাহল ছিল না, আর তিনি যে সাগরমন্থন-জাত সে কথা কোনও কোনও পুরাণেই মাত্র উল্লিখিত। অনেকে উর্বশী ভাবকল্পে বত্তিচেল্লির ভেনাসের প্রভাব দেখেছেন। সে প্রভাব থাকলেও সেটুকু বাহ্য। কেন না অপ্সরারা যে অপ্‌ বা জল থেকে জাত এ ব্যুৎপত্তিতেও অনেকে বিশ্বাস করেন। স্বভাবতই মথ্যমান সমুদ্রের অনেক দানের মধ্যে অপ্‌-জাত উর্বশী একটি না হবে কেন? আবার উর্বশীর সেই জন্মবৃত্তান্তকে যে প্র্যাক্সিটেলিস (তাঁর ক্ষোদিত লুপ্ত মূর্তির অনুকৃতির কথা বলছি), ফিডিয়াস, বত্তিচেল্লি আরও মনোহর ক'রে তোলেন নি তাও কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না; বিশেষ ক'রে প্র্যাক্সিটেলিসের ন্যুড আর রবীন্দ্রনাথের 'নগ্নকান্তি' একেবারে একই কথা। কিন্তু এ সবই হল ঐ উপরিতলের করেস্‌পন্‌ডেনস্‌ খুঁজে বেড়ানো। মূলগত কথা হল অমৃত আর গরলের ঐ বিরোধ অথচ সংযোগ, অঙ্গাঙ্গিত্ব—রোম্যান্টিকের মানসপ্রতিমার মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সহাবস্থান। নারীর এই রূপকল্পনা ভারতীয় ঐতিহ্যে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। ভারতীয় কল্পনায় নারী বিচিত্ররূপিণী, মনোহারিণী, কখনও

বা চণ্ডী—যেমন দ্রৌপদী। • কিন্তু জীবনের লোভ দেখিয়ে যে মরণের মধ্যে নিয়ে যায় নারীর এমন কোনও রূপ প্রাচ্য-চেতনায়, আমাদের দেশে রোম্যান্টিসিজম্ আসবার আগে, স্বীকৃত হয় নি বা দেখা দেয় নি।• সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তা বণ্টন করেছিলেন মোহিনীরূপী বিষ্ণু; তিনি অসুরদের অমৃত থেকে বঞ্চিত ক'রে পরোক্ষে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। কিন্তু গরল যা উঠেছিল তা মহেশ্বর পান ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর হস্তে অমরত্বের আর মৃত্যুর ভাণ্ডার তুলে দেওয়া ঐ প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক চেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভিন্ন ঘটতে পারে না এবং সেই ঘটনার পেছনে যে জীবনবীক্ষা, বা world-view আছে তা হল আত্ম-আবেগ-সর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক অথচ গভীর অনুভূতিপ্রবণ রোম্যান্টিক আদর্শবাদীর চেতনায় আদর্শ আর বাস্তবে দ্বন্দ্বের ফলে সঞ্জাত অমৃতলালসার বাস্তবের মাধ্যমে অতৃপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু। উর্বশী অমৃতকামনায় মনকে উল্লসিত করে, কিন্তু সে অমৃত বাস্তব নারীর স্পর্শে আকাশকুসুমে যেই পরিণত হয় তখন রোম্যান্টিকের তীব্র ক্ষোভ ও আদর্শের অপমৃত্যু—সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীর রাক্ষসীতে রূপান্তর এবং রোম্যান্টিকেরও সত্যলোক থেকে রসাতলে অধোনয়ন। কিন্তু অতি-আশার মুখে ছাই পড়ে বলে আশা তো আর নিরাশ হবে না, বরং নৈরাশ্য আত্যন্তিক বিনাশের বাসনা জাগায় যদি অবশ্য সেই বিনাশ আসে রোম্যান্টিকের ecstasy বা উল্লাসে ভর ক'রে :

"Few things are stranger than the blend in Chateaubriand of this Sadic fury with the new romantic revery....Perhaps no more frenzied cry has ever issued from human lips than that uttered by Atala in describing her emotions when torn between her religious view and her love for Chactas: 'What dream did not arise in this heart overwhelmed with sorrow. At times, in fixing my eyes upon you, I went so far as to form desires as insensate as they were guilty; at one moment I seemed to wish that you and I were the only loving creatures upon the earth; and then again, feeling a divinity that held me back in my horrible transports, I seemed to want the divinity to be *annihilated* provided that *clasped in*

your arms I should roll from abyss to abyss with the ruins of God and the world.' Longing is here pushed to a pitch where it passes over, as in Wagner's 'Tristan and Isolde', into the desire for annihilation." [*Rousseau and Romanticism :* Irving Babbitt]।

এই সঙ্গেই স্মরণীয় Gerard de Nerval-এর কাহিনী। তিনি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব নারীর মধ্যে তাঁর কল্পিত শীবার রাণীকে (Queen of Sheba) খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত একগাছি ফিতেকে শীবার মোজার গার্টার ভেবে তাই দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেন। কীটস নাইটিঙ্গেলের গান শুনে উল্লাসের মধ্যে সমাধি অর্থাৎ জীবনাবসান কামনা করেছিলেন, সুধায় সিক্ত হয়ে মৃত্যুবিষেও তাঁর ভয় ছিল না। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। মর্তপ্রেম তাঁর এত গভীর যে তিনি মর্ত থেকে বিচ্ছেদের বিনিময়ে নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে চান নি। সেই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা মনে আসতেই তাঁর উল্লাসের চটকা গেল ভেঙে। Atalaর মত তিনি সর্বনাশ আর প্রেমের সমীকরণে রাজী হলেন না। কিন্তু অন্যত্র হয়েছেন, তাঁর বিখ্যাত 'নির্মম সেই রূপসী' (La Belle Dame sans Merci) কবিতায়। এ কবিতার নায়িকা মানবী নয়, অপ্সরী। তার চুম্বনের আকর্ষণ এমন দুষ্প্রতিরোধ্য যে সমাজ সংসার-পরিবার সব পরিত্যাগ ক'রে, রাজা পুরূরবার পলাতকা উর্বশীর মৃত্যুপণ অন্বেষণের মত, তিনি তাকে খুঁজেই চলেছেন। উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবা পুনর্মিলিত হয়েছিলেন আর কীটসের কবিতায় যিনি অন্বেষক তিনি শুধু যে অপ্সরা-প্রিয়াকে পাবেন না তাই নয়, তার প্রেমে তাঁর যে সর্বনাশ ঘটবে এ কথাই তাঁকে সেই অপ্সরার প্রাক্তন প্রেমিকেরা স্বপ্নে জানিয়ে দিচ্ছেন :

I saw pale Kings, and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all ;
Who cry'd—'La belle dame sans merci
Hath thee in thrall.'

I saw their starv'd lips in the gloam
With horrid warning gaped wide,
And I awoke, and found me here
On the cold hill side.

অমানুষী প্রেমের বিষে মানুষ প্রেমিক জ্ব'লে-পুড়ে গেল। তবু সে প্রেম অপরিত্যাজ্য। সর্বনাশিনী এই অপ্সরার অতঃপর মোহিনী রাক্ষসীতে বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মোহিনী হ'য়ে ভুলিয়ে সে পরে রাক্ষসীর আসল রূপে শিকারকে ভক্ষণ করে। এরকম বহু মোহিনী রাক্ষসীর কাহিনী রূপকথায় পাওয়া গেছে কিন্তু মানুষের শৈশবের অবাধ সেই কল্পনাবিহার যে উনিশ-শতকে রোম্যান্টিক চেতনায় জীবনসত্যের আকারে দেখা দিল এবং নারী-চরিত্রের ওপর আরোপিত হল, এ এক অভিনব বিবর্তন। হয়তো Jung এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁদের archetypal Pattern-এর প্রকল্পে এই রূপকথার পেছনের সত্যকে ধ'রে দিতে পারবেন। কিন্তু রোম্যান্টিক চেতনায় এই যে নারীর স্ববিরোধী রূপ, অতিভাষিত হলেও, সত্যব'লে উপলব্ধ হয়েছে, এর সরল এবং চরম রূপায়ণ কীটসের Lamia কবিতাতে। Lycius-এর অনবদ্যাঙ্গী প্রিয়া Lamia আসলে মায়াবিনী সর্পিণী। মিলনের মুহূর্তে এই সত্য হঠাৎ আবিষ্কৃত হওয়ায় Lamiaর অন্তর্ধান এবং Lycius-এর মৃত্যু—Lamiaর বিষে Lycius-এর নাশ। Lamiaর আসল রূপ ধ'রে ফেলেছিলেন বিজ্ঞ Appllonius, Lycius-এর গুরু। প্রথমে Lycius গুরুর কঠোরতায় এবং Lamiaর অস্বস্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে গুরুকে ভর্ৎসনা করছিল। তখনও চরম মুহূর্তটি আসে নি। কিন্তু Apollonius সব ভেলকি ধ'রে ফেলে শিষ্যের ভর্ৎসনার প্রতিবাদে বললেন :

"Fool !" said the sophist, in an undertone
Gruff with contempt;

তারপর যা ঘটল তা এই :

Which a death-nighing moan
From Lycius answer'd, as heart-struck and lost,
He sank supine beside the aching ghost.
"Fool ! fool !"repeated he, while his eyes still
Relented not, nor mov'd ; "from every ill
"Of life have I preserv'd thee to this day,
"And shall I see thee made a serpent's prey ?"
Then Lamia breath'd death breath ; the sophist's eye
Like a sharp spear, went through her utterly,

Keen, cruel, perceant, stinging : she, as well
As her weak hand could any meaning tell,
Motion'd him to be silent ; vainly so,
He look'd and look'd again a level—No !
"A serpent !"echoed he ; no sooner said,
Than with a frightful scream she vanished.
And Lycius' arms were empty of delight,
As were his limbs of life, from that same night,
On the high couch he lay ! his friends came round--
Supported him— no pulse, or breath they found,
And, in its marriage robe, the heavy body wound.

এই হল নারীর চারিত্র বৈপরীত্যের চূড়ান্ত রূপ—সুধা আর বিষের দ্বন্দ্বের নিরসন। ফরাসী রোম্যাণ্টিকদের রচনায় এই বৈপরীত্য একটি প্রধান বিষয় : যেমন Victor Hugo :

Death and beauty are two deep things which hold so much shade and light, that one might say they were two sisters equally terrible and fertile, holding the same enigma and the same secret...

Judith, our two fates are nearer one another than one would think, to see my face and yours ; the whole divine abyss appears in your eyes.

[*Ave, Dea ; moriturus te salutat. A Judith Gautier*]

অথবা Nerval :

My brow is still red from the queen's kiss ; I have dreamed in the cave where the siren swims.

[*El Desdichado*]

বা

She whom I loved alone still loves me tenderly ; she is death —or the dead...O delight ! O torment ! The rose she holds is the Hollyhock (*Rose tremiere*).

শেষ পর্যন্ত Baudelaire :

I adore you as much as the vault of night, O vessel of sorrow, O tall, silent woman...... I advance to the attack and I climb to the assault like a band of worms on a corpse, and I hold dear, O mercilessly cruel beast! even that coldness through which you appear more beautiful to me!

[Je t'adore a' l'e'gal de la vinte nocturne]

ইংরেজীতে এই বৈপরীত্যের প্রায় বোদলেয়ারের মতই অস্বাস্থ্যকর প্রকাশ যে সুইনবর্নের কবিতায় তাও অনেক আগেই স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথেরই উর্বশী কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। Atalanta in Calydon-এর সেই বিখ্যাত কোরাসের সঙ্গে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে উর্বশীর বহুল সাদৃশ্য তো আছেই। সেগুলি আপতিক হতে পারে। মূলগত মিল হল ঐ বিষামৃতের, জীবন আর মৃত্যুর সহাবস্থানে; বাস্তব নারী-চরিত্রের স্ববিরোধী রূপের, মোহিনীর আর রাক্ষসীর পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক উপস্থাপনে :

For all they said upon earth
She is fair, she is white like a dove
And the life of the world in her breath
Breathes, and is born at her birth;
For they knew thee for *mother of love,*
And knew thee not *mother of death.*

অমৃতে যে উর্বশী-অনুরাগের শুরু বিষেই তার শেষ ব'লে সে অনুরাগের একমাত্র পরিণাম হল যন্ত্রণা, মর্মদাহ। তাই উর্বশী কবিতার তৃতীয় স্তরের সূচনায়

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা।

আবার সুইনবর্নে আসতে হয় :

Thou shouldst not so have been born :
But death should have risen with thee,
Mother, and visible fear,
Grief, and the wringing of hands,
And noise of many that mourn;

The smitten bosom, the knee
Bowed, and in each man's ear
A cry as of perishing lands,
A moan as of people in prison,
A tumult of infinite griefs ;

এই জন্যেই সে মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়—সে স্বৈরিণী, নিষ্ঠুরা, বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী। সে পুরুষকে উন্মাদ করে, কামনাবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখায় গ্রসমান পুরুষকে কখনই সম্বিৎ ফিরে পেতে দেয় না। স্বভাবতই এই অমঙ্গল-রূপিণীকে চিনেও পুরুষ চেনে না :

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

Keats-এর কবিতাতে Knight-at-arms-ও অমনি করে কেঁদে বেড়াচ্ছে। রোম্যান্টিক কবিদের সারা আকাশই এই অতৃপ্ত কামনার তাপে যেন দপ্ দপ্ করছে। এ কামনাতে লজ্জা নেই ; এ কামনাকে দমন করার, সহজ ক'রে আনার কোন প্রয়োজন নেই ; কেন না মানুষ রোম্যান্টিকের কাছে স্বভাবতই সুন্দর, অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলুষ। তাই তার অবাধ যৌন কামনাও সুন্দর। এই চিন্তাধারা ভারতীয় বা প্রাচ্য চিন্তাধারার একেবারে বিরোধী, এ একেবারে প্রতীচ্যের ইহসর্বস্ব জীবন-বেদের প্রত্যক্ষ ফল। এই ঐহিকতার মধ্যেও, এই ভোগসর্বস্বতার মধ্যেও এক প্রকারের ভূমোপলব্ধি ঘটে। কিন্তু সে ভূমা, আর স্থিরচিত্ত, অন্তর্মুখী, তপস্যালব্ধ ভূমার উপলব্ধি, দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। রোম্যান্টিক কবিও কথায় কথায় অনন্তের কথা বলেন আর স্থিরচিত্ত যতিও অনন্তের উপলব্ধির কথা বলেন। আমরা অত্যন্ত অসতর্কতার বশে এঁকেও বলি মিস্টিক ওঁকেও বলি মিস্টিক। এই দুই প্রকারের অনন্তের উপলব্ধি প্রসঙ্গে Irving Babbitt বলেছেন :

It is perfectly true that there is something in man that is not satisfied with the finite, and that, if he becomes stationary, he is not once haunted by the spectre of ennui. Man may indeed be defined as the insatiable animal ; and the more imaginative he is the more insatiable he is likely to become, for it is the imagination that gives him access to the infinite

in every sense of the word . . . Now religion seeks no less than romance an escape from ennui. But (religion and romance) differ utterly in the remedies they propose for ennui. Baudelaire (the romantic) hopes to escape from ennui by dreaming of the superlative emotional adventure, by indulging in infinite, indeterminate desire, and becomes more and more restless in his quest for a something that at the end always eludes him. This infinite of nostalgia has nothing in common with the infinite of religion. No distinction is more important than that between the man who feels the divine discontent of religion, and the man who is suffering from mere romantic restlessness. According to religion man must seek the satisfaction that the finite fails to give by looking not without, but within ; and to look within he must, in the literal sense of the word, undergo conversion. A path will then be found to open up before him, a path of which he cannot see the end. He merely knows that to advance on this path is to increase in peace, poise, centrality ; though beyond any calm he can attain is always a deeper center of calm....If this inner and human infinite cannot be formulated intellectually, it can be known practically in its effect on life and conduct...Religion itself...becomes in Blake the mere sport of a powerful and uncontrolled imagination, and this, we are told, is mysticism. I have already contrasted with this type of mysticism something that goes under the same name and is yet utterly different—*the mysticism of ancient India.* Instead of conceiving of the divine in terms of expansion the oriental sage defines it experimentally as the "inner check."[১০]

অর্থাৎ ভোগসর্বস্ব মানুষের অনন্ত বাসনার নির্যাস দিয়ে নির্মিত উর্বশী শান্তি বা

তৃপ্তির চরম মূল্যে মানুষকে দেয় ব্যর্থতার আর নৈরাশ্যের জ্বালা—সেই বিষ যা অনিবারণীয় তৃষ্ণায় মানুষকে মরীচিকার দিকে আরোও ঠেলে দেয়। পুরুষ তাকে রাক্ষসী বলে, ভয় পায়; আবার মানসী বলে, কাছেও টানে। এই হল ইহসর্বস্ব পুরুষের জীবনের অনুলোম আর প্রতিলোম গতি। এই মানসিকতাকে ভারতীয় জীবনদর্শন কখনও অনুমোদন করে নি, কিন্তু উনিশ শতকে ইহমুখী জীবনবেদ আপন ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে এখানে এসে, ভারতের সুপ্রাচীন weltans-chauungকে বিপর্যস্ত করে দিল, ইংরেজী শিক্ষিতের মন ভরে দিল romantic weltschmerz-এ, সেই রোম্যান্টিক ইহমুখিতারই একটি দিকের পরিণতি হল এই চেতনা। প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক কাব্যে এই চেতনার অবারিত বিকাশ সম্পর্কে Mario Praz-এর মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য:

There is no end to the examples which might be quoted from the Romantic and Decadent writers on the subject of this indissoluble union of the beautiful and the sad, on the supreme beauty of that beauty which is accursed. Even Victor Hugo, in whose veins certainly did not flow the tormented blood of such as Shelley, Keats, Flaubert, and Baudelaire, nevertheless solemnly asserted, rather in Baudelaire's manner, the relationship between Beauty and Death. In fact, to such an extent were Beauty and Death looked upon as sisters by the Romantics that they became fused into a sort of two-faced herm, filled with corruption and melancholy and fatal in its beauty—a beauty of which, the more bitter the taste, the more abundant the enjoyment. *[The Romantic Agony.]*[১১] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই উপভোগের বিবমিষা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছান নি। তার আগেই তিনি নিজেকে সামলেছেন। কেন যে সামলেছেন সে কথা স্বতন্ত্র। তাঁর মজ্জাগত ভারতীয় জীবনদর্শন, শেষ 'গ্রাম' পর্যন্ত যাবার আগেই তাঁকে লক্ষ্মী আর উর্বশীর পার্থক্য উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছে।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি

নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে ॥
আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর। (বলাকা ২৩)

তবু তাঁকে বিলাপ করতে হয় "ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী। অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।" কেন ?

চার

প্রথম কারণ 'চিত্রা'র অনেক পরে 'বলাকা'। তারও পরে 'পুনশ্চ'। সেখানে উর্বশী নিজেই মর্তোন্মুখী, স্বর্গক্লান্ত, বিরহিণী :

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, "দেবী, তুমি দেবলোকবাসিন'
অতি-সম্পূর্ণ তোমা: মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরা,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার জন্যে।"

উর্বশী বললেন,

কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর!
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে!
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়
মর্তকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রায়াজন মর্তের,
তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্তের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।"

উর্বশীর মর্তে এই দ্বিরাগমনেই বোঝা যাচ্ছে যে 'বলাকা'র লক্ষ্মী, কল্যাণরূপিণী হওয়া সত্ত্বেও, মর্ত্য-জনের পূজ্য হয়েই আছেন, আরাধ্য হয়েই আছেন, মনোহরণ করতে পরেন নি, এনে দিতে পারেন নি পুরুষের মনে চন্দ্রোদয়ারম্ভে সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাস, যে উচ্ছ্বাসের মূল্য সেই উচ্ছ্বাসেই, যা মূল্যান্তরনিরপেক্ষ, আপন প্রভায় ভাস্বর। সমাজের গতানুগতিক রক্ষণশীল চেতনা সৃষ্টি করেছে লক্ষ্মীকে। তাঁকে না হলে সংসারযাত্রা সুনির্দিষ্ট পথে চলে না, দৈনন্দিন জীবনের চক্র যেখানে-সেখানে থেমে যায়, শৃঙ্খলা শ্রী হয় জীবন থেকে অন্তর্হিত। মনুষ্যসমাজের যুগযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা এই কথা বলছে এবং রবীন্দ্রনাথও সেই চেতনার বশবর্তিতায় লক্ষ্মীকে আবাহন করেছিলেন, স্বীকার ক'রে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের মধ্যে যে সনাতনী সে এমনি ক'রেই জীবনের আটঘাট বেঁধে জীবনযাত্রাকে সুশৃঙ্খল করতে চায়, সবকিছুর অনুপাত ঠিক ক'রে দিয়ে সৃষ্টি করতে চায় সুষমা। ভারতে ইনি লক্ষ্মী সনাতনী; গ্রীসে ছিলেন হার্থা। এই লক্ষ্মী যে মানুষকে প্রভাবিত করেন সে মানুষের প্রকৃতি হয়ে ওঠে classical বা সুষম। তিনি যা সৃষ্টি করেন তার চরিত্র হয় সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নাতিভাষিত। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য সেখানে দমিত। কবি বা শিল্পী সেখানে আত্মহারা নন, আত্মস্থ। এই আত্মস্থতা যেমন মানুষের চরিত্রে প্রকট হয় তেমনি আবার সমাজ-জীবনেও প্রকট হয়। সত্যি কথা বলতে কি, সমাজ-জীবন কেন্দ্রিকতা আর উৎকেন্দ্রিকতা, আত্মস্থতা আর উন্মার্গিতা—এই দুই শক্তির নিরন্তর দ্বন্দ্বেই চালিত। যখন যেটি প্রবল হয় সমাজ-জীবনে তারই লীলাবৈচিত্র্য চলে। পেরিক্লিয়ান গ্রীসে কেন্দ্রিকতা বা classicalityর প্রকাশ; অগাস্টান রোমেও তাই। অবশ্য ক্ল্যাসিক্যাল মনোবৃত্তিরও প্রকাশ আবার যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এবং পৃথক পৃথক জাতীয় চরিত্রের মাধ্যমে। তাই সফোক্লিস আর সেনেকা, ডিমস্থিনিস আর সিসিরো সমানধর্মীও নন, সমকীর্তিও নন। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল যুগ হল কালিদাসের যুগ। কালিদাসের সাহিত্যে সেইজন্যে পাওয়া যাবে না সেই অভাবিত, অনির্দেশ্য, অসামান্যের জন্যে দুর্দমনীয় আকূতি, যা হল গিয়ে রোম্যান্টিক চেতনার একটি দিক। কালিদাসের কাব্যে লক্ষ্মীর শ্রী। তাঁর যক্ষ বর্ষাগমে অবিরত জলধারার পতনের শব্দে, "শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে" যে "শতেক যুগের গীতিকা" রচনা ক'রে চলেছে তার জন্যে মোটেই ব্যাকুল নয়, সে ব্যাকুল এক বিশিষ্ট যক্ষিণীর সঙ্গসুখের জন্যে। এই ক্ল্যাসিক্যাল বা

কেন্দ্রানুগ, সুষম মনোবৃত্তির প্রথম বিক্ষেপ আমাদের দেশে ঘটে মধ্যযুগে অর্থাৎ কবীর-দাদু-নানক-চৈতন্যের সময়ে।

আমরা সেই চিত্তবিক্ষেপকে বলেছি ভাবপ্লাবন, ভাবযমুনা উদ্বেল হওয়া ইত্যাদি। ভাবপ্লাবনে বা ঐ জাতীয় কোনো প্লাবনে আপত্তির কোনও কারণ নেই কিন্তু লক্ষ্মণসেনের আমলে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পেছনেও ঐ রকম প্লাবন তাহলে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, কেন না জয়দেবের গানগুলিও প্রাকৃত জনের আস্বাদনের জন্যেই রচিত ব'লে অনেকের ধারণা। তা ছাড়া চণ্ডীদাস (যিনি মহৎ গীতিকবি চণ্ডীদাস তিনি) এবং বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ব। এই দুজনকে বাদ দিলে, যে বৈষ্ণবগীতিকবিতা নিয়ে আমাদের গর্ব তার কতখানি থাকে? সে যাই হোক, চৈতন্যোদয়ে ভাবপ্লাবন স্বীকার ক'রে নিলেও সেই উদ্বেলিত ভাবসমুদ্রের ভিত্তিমূলক চেতনা হল নর-নারীর যৌন সম্পর্ক, আর কিছু নয়। সেই চেতনাতেও আবার নারী হল নির্বিশেষ নারী—স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ, ব্যক্তিস্বাধীনতায় অধিকারিণী, আপন ব্যক্তিমূল্যে আস্থাবতী নারী নয়। সে নারী আবার শুধু সাধনসঙ্গিনী অর্থাৎ সাধনার সাধন মাত্র। সে নারী শক্তিরূপিণী কিন্তু সাধারণ মর্ত্য নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটুকুও তার নেই। অর্থাৎ চৈতন্যমথিত ভাবযমুনায় সেই ধর্মীয় সাহিত্যেরই তরঙ্গ-ভঙ্গ যার মৃদু বীচিবিভঙ্গ তথাকথিত মঙ্গলকাব্যে। তফাৎ শুধু এই যে, মঙ্গলকাব্যের ভয়মূল ভক্তির স্থান যৌনকামনা দখল করায় প্রবৃত্তির উৎসমুখ গেল খুলে; সকলেরই লাগল ভাবের ঘোর। এর মধ্যে মানবতাবাদ বা **humanism** এবং ঐহিকতা বা **secularity**—কোনটিরই নামগন্ধ নেই। এই কারণেই অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলা হয় যে, সত্যিকারের যুগান্ত বা ভাববিপ্লব বাংলাদেশে এসেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি, তার আগে নয়। জীবনের প্রতি যে ক্ল্যাসিক্যাল **attitude** উনিশ-বিশের দোল খেতে খেতে চ'লে আসছিল তাতে প্রথম ধাক্কা লাগল ঐ উনিশ শতকে প্রতীচ্যস্পর্শে। এল মানবতাবাদ-নির্ভর, ঐহিকতা-পুষ্ট রোম্যান্টিক চেতনার বিচিত্র ধারা। ক্ল্যাসিক্যাল লক্ষ্মী হলেন অপ্সরা উর্বশীর কাছে লাঞ্ছিত। সেই উর্বশীর না আছে পিতা, না আছে মাতা, না গৃহ, না গৃহস্থালি। এক কথায় সে অলক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী আর উর্বশী মানুষের চেতনার দুই বিপরীত কোটিতে বিরাজ করেন—ঘর বাঁধতে-চাওয়া, ক্ল্যাসিক্যাল চেতনা-সম্পন্ন মানুষ লক্ষ্মীর আরাধক আর ঘরছাড়া আত্মকেন্দ্রিক সুদূরের হাত-ছানিতে বিমুগ্ধ, রূপান্বেষী মানবাত্মা উর্বশীর অনুসন্ধানী। রোম্যান্টিক চেতনায়

উর্বশীর একাধিপত্য। তাই ব'লে কখনও কি লক্ষ্মী সেখানে প্রভাববিস্তার করেন না? করেন। তখন লক্ষ্মী-উর্বশীর দ্বন্দ্বে সাময়িকভাবে লক্ষ্মী বিজেত্রী। তখন রোম্যান্টিকের শুরু হয় খেদ। প্রবৃত্তির পথে অবাধ বিচরণ বাস্তব জীবনে পদে পদে ব্যাহত। বর্তমান বাস্তব যখনই নিরন্তর ব্যর্থতার বোঝা বহন করায় তখনই মানুষ কল্পনা করে অতীতের স্বর্ণযুগের। Schiller তাঁর বিখ্যাত কবিতা Gotter Griechenlands-এ আক্ষেপ করেছেন সেই কাল্পনিক pagan যুগের জন্যে, যখন আনন্দে ছিল না দ্বিধা, সৌন্দর্যে ছিল না কলুষ, দেবে-মানবে ছিল সৌন্দর্য-বিলাস। কিন্তু অস্তাচলবাসিনী উর্বশী। তাই রোম্যান্টিকের বিলাপ। এ বিলাপ অস্মদ্দেশের সাহিত্যে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে অপ্রাপ্য। অথচ ফরাসী রোম্যান্টিক কবিতায় এ আকুলতার যত্রতত্র দেখা মেলে :

"O time, suspend your flight ! And you, propitious hours, suspend your course ! Let us taste the swift delights of the fairest of our days"...

"Jealous time, can it be that these moments of intoxication, when love pours us happiness in long draughts, fly far away from us with the same speed as days of misfortune ?

"What ! Can we not preserve their trace at least ? What, Gone for ever ! What ! All quite lost ?"

(Alphonse De Lamartine)

অথবা

"How distant you are, scented paradise, where beneath a clear blue sky there is only love and joy, where everything we love is worthy to be loved ! Where the heart is drowned in pure pleasure ! How distant you are, sacred paradise."

(Charles Baudelaire)

ইংরেজীতেও Keats বিষণ্ণ, কেন না "Fled is that music", তিনি সেই কালের কথা ধ্যান করেন]

When holy were the haunted forest boughs,
Holy the air, the water, and the fire ;

মানুষের বহু ভাগ্য যখন

...'Tis the nicest touch of human honour,
When some ethereal and high-favouring donor
Presents immortal bowers to mortal sense ;
As now 'is done to thee, Endymion...
Here is wine...

Alive with sparkles—never, I aver,
Since Ariadne was a vintager,
So cool a purple : taste these juicy pears...
Here is cream,
Deepening to richness from a snowy gleam ;
Sweeter than that nurse Amalthea skimmed
For the boy Jupiter : and here, undimm'd
By any touch, a bunch of blooming plums
Ready to melt between an infant's gums :
And here is manna pick'd from Syrian trees,
In starlight, by the three Hesperides.

(Endymion)

এই সৌভাগ্যের অধিকারী Adonis হয়েছিল। কিন্তু সে দ্বিধা করেছিল, ভয় পেয়েছিল ; তাই ভেনাসের হয়েছিল অভিমান ; নির্বোধ মর্তবাসী দেবীপ্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাতে তার কোন খেদ ছিল না। উর্বশী-বাঞ্ছিত অর্জুনেরও মনে কোনও খেদ আসে নি। না আসাই স্বাভাবিক, কেন না অর্জুন, যিনি একদিন ঘটনার চাপে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর privacy ক্ষুণ্ণ করার অপরাধে বনবাসী হয়েছিলেন, যাঁর নারী-সঙ্গ-লিপ্সা আবেগের আতিশয্যে নারী-স্তবে এবং নারীর দেবীকরণের স্তরে পৌছনো সম্ভব ছিল না, যিনি মঙ্গলধর্মে এবং সমাজবন্ধনের কল্যাণকারিতায় একান্ত আস্থাবান, যিনি গীতায় সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ক্ল্যাসিক্যাল মনোবৃত্তি-চালিত, তাঁর পক্ষে অপ্সরা-প্রেম সম্ভব নয়, আর সম্ভব হলেও তা বিচ্ছেদে কোন আকুল বিরহের সৃষ্টি করে না। তিনি উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করায় উর্বশী তাঁর পুরুষত্বকে ধিক্কার দিয়েছিলেন; কেননা অর্জুনের পৌরুষ উর্বশী-প্রভাবে

স্তম্ভিত হয়েছিল। তাই অর্জুনের নপুংসকত্ব। কিন্তু আধুনিক কবি অপ্সরার এই মর্তানুরাগের ব্যর্থতায়, মানুষের হাতে স্বর্গ এসে ফিরে যাওয়ায়, অধীর হ'য়ে উঠে ঐ উর্বশীর মতই প্রত্যাখ্যানকারীর পরিবাদ করেছেন :

The sea-born goddess pin'd
For a mortal youth, and how she strove to bind
Him all in all unto her doting self.
Who would not be so prison'd ? but, fond elf,
He was content to let her amorous plea
Faint through his careless arms ; content to see
An unseiz'd heaven dying at his feet ; (Ibid)

রোম্যান্টিকের এই অমানুষী প্রেম—যখন অমানুষী এসে ধরা দিয়েছিল স্বর্ণযুগের নিকষিত স্বর্ণশৃঙ্খলে, যখন "ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে"—তা এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বিরহে। কিন্তু বিরূপ-বাস্তব-নিষ্পিষ্ট রোম্যান্টিক "অস্তাচলবাসিনী উর্বশী" ব'লে বিলাপ করেই ক্ষান্ত হন না; তিনি তখন এই কল্পনায় সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন যে, উর্বশী বা অপ্সরা নিষ্ঠুরা নয়; সেও মর্ত-প্রেমে উন্মনা, সেও মর্তাভিলাষিনী। স্বর্গে আকাঙ্ক্ষা নেই, স্বর্গে উর্বশীর সৌন্দর্য ব্যর্থ, তার আকুলতা নিষ্ফল। তাই 'পুনশ্চ'তে উর্বশী মর্তমুখী। রবীন্দ্রনাথ এখানে পৌরাণিক উর্বশীর বহুবিদিত অভিশাপ ও ক্রোধকে মর্তোন্মুখী বিরহিনীর ভাষণে রূপান্তরিত করেছেন। রোম্যান্টিক চেতনার চক্রাবর্তন তবেই সম্পূর্ণ হয়েছে। ঠিক এই জিনিস ঘটেছে Shakespeare-এর *Venus & Adonis*-এ বা Marston-এর *Metamorphosis of Pygmalion's Image*-এ। কিন্তু রেনেসাঁস চেতনায় রোম্যান্টিকের ভাবাতুরতার, বিলাসের সূক্ষ্মতার অভাব। সে জিনিসের সাক্ষাৎ মিলছে Morris এর *Earthly Paradise*-এ, Gilbert-এর Comedy *Pygmalion & Galatea*-তে; বিশেষ ক'রে Keats এর *Endymion*-এ এবং Swinburne-এর *Nympholept*-এ, যার দুটি বিখ্যাত পঙক্তি হল :

I dare not sleep for the delight of the perfect hour
Lest God be wroth that his gift should be scorned of man.

পুরাণের উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিয়েছিল, কেন না অর্জুন স্বর্গেও বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন মর্তের স্মৃতি—তিনি মর্তকে ভুলতে চান নি, মর্তকে তাঁর

অবাঞ্ছনীয় মনে হয় নি; বরং মর্তে ফিরে আসতেই তিনি ব্যাকুল। তিনি ঠিক রোম্যান্টিকের বিপরীত, কেন না রোম্যান্টিকের nostalgia ঐ স্বর্গের জন্যেই—যে স্বর্গ সে হারিয়েছে কিন্তু যার স্মৃতি তাকে নিরন্তর আর্ত ক'রে রেখেছে। কখনও কারও সান্নিধ্যে সেই স্মৃতির প্রাগিতিহাস মথিত হ'য়ে ওঠে, মনে হয় এই তো সেই, কিন্তু পুনঃপ্রাপ্তি আর সম্ভব নয় ব'লে আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে বিরহ :

কথা বলিবারে গেনু কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে॥......

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বার পাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

তখন স্বভাবতই রোম্যান্টিক ক্ষতিপূরণ করে উর্বশীকে মর্ত-পিপাসু ক'রে। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন 'পুনশ্চ'তে। তাই উর্বশীর মর্তাভিসার—Venus বা Psycheর মত। ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চেতনায় অপ্সরার মর্ত-মানবীতে রূপান্তরের প্রয়োজন কখনও অনুভূত হয় নি। ইংরেজ Pre-Raphaelite কবি D. G. Rossetti আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে স্বর্গত মানবীর মর্ত-কামনার আকুলতা বর্ণনা করছেন; আবার ব্রাউনিঙে দেখি মর্তপ্রেমিক স্বর্গসুখ কামনা ক'রে স্বর্গে মর্তসুখেরই অব্যাহত প্রবাহ কামনা করছে, সে স্বর্গে গিয়ে সোজা মর্তপ্রিয়ার বক্ষলগ্ন হতে চায় :

For sudden the worst turns the best to the brave,
The black minute's at end,
And the elements' rage, the fiend-voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,

Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, *then thy breast.*

এ সবই হল রোমাণ্টিকের ইহ-মুখিতার বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথেও তাই। রবীন্দ্রপূর্বদের মধ্যে এই ইহমুখী পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিকতা দেখা গিয়েছে প্রধানত মধুসূদন আর বিহারীলালের মধ্যে, কিন্তু এর পূর্ণপ্রস্ফুটিত রূপ রবীন্দ্রনাথেই প্রাপ্য।

পাঁচ

কিন্তু সমস্যা হয়েছে পুরুষ-হৃদয়-বিহারিণী, বিলাসবিভ্রমময়ী, মূর্ত শৃঙ্গার, রোম্যান্টিকের অমর্ত্য যৌন আবেগের উদ্দীপিকা এই যে উর্বশী, যে সুধা-বিষে মাখা তার নৃত্যোল্লাসে কেমন ক'রে

> ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
> তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা— ?

রবীন্দ্রনাথ আবেগের আতিশয্যে এই যে উর্বশীকে তাবৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ ব'লে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, এর কি ব্যাখ্যা ? কেবলমাত্র বুদ্ধিনির্ভর যুক্তির পথে এর ব্যাখ্যা কেন, কোনও উত্তম লিরিকেরই ব্যাখ্যা সম্ভব নয় ; কেন না মানুষের অভিজ্ঞতার সমগ্রতা, সে কোনও একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাও, মানুষের মনের সমগ্র বৃত্তিকেই উদ্দীপ্ত করে এবং লিরিক কবিতায় মনের বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সাধারণত গৌণ, বিশেষ ক'রে রোম্যান্টিক লিরিকে। Keats যখন "Beauty is truth, truth beauty" বলেছিলেন বা Coleridge-এর হাত থেকে যখন Kubla Khan নিঃসৃত হয়েছিল তখন বিশ্লেষণাত্মক চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধির সেই সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রায় লুপ্ত হয়েছিল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথও যখন 'বিশ্বের কামনারাজ্যের রানী'র কথা বলতে বলতে, আপন ভাবের আন্তর প্রবর্তনায় তাকে প্রকাশমান বিশ্ববৈচিত্র্যের কেন্দ্রগ সত্তা ব'লে আবাহন করলেন তখন সেই আবাহনের পেছনে যে চিত্তবৃত্তি কাজ করেছিল তা বিশুদ্ধ যৌন আবেগ-সঞ্জাত রূপ-তৃষ্ণার স্বপ্নায়িত বিশ্বগ্রাসী ভাবোন্মাদনা মাত্র নয় ; সে চিত্তবৃত্তি ভারতীয় তান্ত্রিক শক্তি-তত্ত্বেও গিয়ে সমাহিত হতে চায়। **এইখানেই প্রতীচ্যাগত রোম্যান্টিক চেতনার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য-জাত শক্তিবাদের সংঘাত বেধেছে।** মোহিতলাল মজুমদার এই দুই ভাবকে পরস্পরবিরোধী মনে করেছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন যে এই দুইয়ের সহাবস্থানের ফলে কবিতাটির সৌন্দর্যহানি ঘটেছে— অলঙ্কারের ভাষায় রসাভাস সূচিত হয়েছে। সত্যিই এ কথা যদি কারও মনে হয় যে সুরসভাতলে নৃত্য করতে করতে হঠাৎ উর্বশীর এ কি রূপান্তর ঘটল যে তাঁর নৃত্যের ছন্দ আর নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ এক হয়ে গেল এবং বিশ্বের তৃণে-জলে এমন

কি অন্তরীক্ষে পর্যন্ত নব নব সৃষ্টির উচ্ছ্বাস বয়ে গেল, তাতে বলবার কিছু নেই আপাতত। অপ্সরার কোন্ মন্ত্রবলে মহাশক্তি বা মহামায়াতে রূপান্তর? এ অসম্ভব, এ কষ্টকল্পনা। রোম্যান্টিক ভাবপ্রবাহে একেবারে ভেসে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, গত্যন্তর না দেখে পুরুষের হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে বিশ্বব্যাপী ক'রে দিয়ে উর্বশীকে মহাশক্তির স্থলাভিষিক্ত ক'য়ে দিলেন। এতে স্থূল যৌন আবেগের হাত থেকেও বাঁচা গেল আবার পুরুষের হৃদয়ের যৌন আবেগকে সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিতরঙ্গ-কম্পনের সঙ্গেও মিলিয়ে দেওয়া গেল। গেল তো। কিন্তু মিলল কি? যাঁরা রবীন্দ্রনাথে শুধুই প্রাচ্যকে দেখতে পান তাঁরা এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন কি না জানি না; পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-স্পৃষ্ট না হলে রবীন্দ্র-চেতনায় এ দ্বন্দ্বের কোনও স্ফুরণই হত না। তাঁর চেতনা একমুখী হ'য়ে ঐতিহ্যসম্মত পথে প্রবাহিত হত।

আচার্য সুনীতিকুমার যে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ভাবকল্পে আদ্যাশক্তির, সৃষ্টির সারভূতা সত্তার সন্ধান পাচ্ছেন সে ঐ ক'টি পঙ্‌ক্তির জন্যেই বিশেষ ক'রে। এবং যাঁরা এই প্রসঙ্গে Shelley-র *Hymn to Intellectual Beauty*র কথা তোলেন তাঁরাও সম্ভবত ওই পঙ্‌ক্তিক'টিই বিশেষ ক'রে স্মরণে রাখেন। কিন্তু Shelleyর ঐ কবিতার নামের আসল অর্থ হল The spirit of Beauty that consciously directs the cosmic forces. রবীন্দ্রনাথের উর্বশী 'কুন্দশুভ্রনগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা' অপ্সরী হলেও তাঁর শক্তির উৎস তাঁর দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্য নয়। তিনি বিশ্বব্যাপারকে সৌন্দর্যের তাত্ত্বিক সত্যের দ্বারা ধারণ বা লালন করেন না; তিনি তাঁর রমণীয় বিলাসবিভ্রমে, ভঙ্গীতে, ঐশ্বর্যে নিজের যৌন আকর্ষণকে বহুগুণিত ক'রে অকস্মাৎ পুরুষকে আত্মবিস্মৃত করেন এবং সেই আত্মবিস্মৃতিতেই পুরুষ যেন সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। Shelleyর hymn-এর বস্তুমূলের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। শেলীতে যিনি স্তূয়মান তিনি Spirit of Beauty এবং awful Loveliness নামে স্তুত হলেও তাঁর ধর্ম কি? Shelley বলেছেন:

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought and form,—

তারপর

No voice from some sublimer world hath ever

To sage or poet these responses given—
Therefore the names of Demon, Ghost and Heaven,
Remain the records of their vain endeavour.
Frail spells—whose uttered charm might not avail to sever,
From all we hear and all we see,
Doubt, chance, and mutability.
Thy light alone...
Gives grace and truth to life's unquiet dream.

এই সত্তা যিনি

Dear, and yet dearer for its mystery

যার স্পর্শ Shelley প্রথম পেয়েছিলেন যৌবনে জীবন-রহস্য সন্ধান করতে করতে :

Sudden, thy shadow fell on me;
I shrieked, and clasped my hands in ecstasy!

জীবনের কেন্দ্রীয় সত্যের যে আকস্মিক আলোকপাতে শেলী উল্লাসে আত্মহারা হলেন তার সঙ্গে সুরসভাতলে নৃত্যপরা বিলোল-হিল্লোল যে উর্বশীর চরণশোণিমা ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা, তার কোন সুদূরতম মিলও নেই। সবচেয়ে বিস্মিত হই যখন দেখি যে, যাঁরা এই দুই কবিতার মধ্যে ভাবসাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী বলার আগ্রহাতিশয্যে কি ক'রে ভুলে গেলেন যে উর্বশী ঘটান ত্রিলোকের চিত্তবিক্ষেপ আর Shelley-র কাম্য :

Thus let thy power, which like the truth
Of nature on my passive youth
Descended, to my onward life supply
Calm—...

শেলী আর রবীন্দ্রনাথে এখানে একান্ত বিরোধ।

'উর্বশী' কবিতার স্তর-স্তরান্তরে প্রতীচ্য রোম্যান্টিক ভাবধারার গভীর অনুপ্রবেশ যে রয়েছে এ কথা প্রমাণিত, কিন্তু এই অন্তিম স্তরে যেখানে মহাশক্তির সৃষ্টিলীলার সঙ্গে উর্বশী সমীকৃত সেখানে প্রাচ্য শক্তি-cult-এর ঐতিহ্য রবীন্দ্র-মানসের গুহাভ্যন্তর থেকে উঠে, তাঁর সচেতন মনের ব্রাহ্ম-cult সত্ত্বেও, তাঁর চিত্তের প্রতীচ্য-প্রলেপকে সবলে ভেদ ক'রে উৎসারিত হয়েছে এবং কবিতার বাকীঅংশের

বস্তুমূলের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে কবিতাটিকে অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করেছে। পাশ্চাত্ত্য তাঁকে এমন ক'রে পেয়ে না বসলে এই দ্বন্দ্ব এমন তীব্র হত না এবং কবিতাটির আবেদনের ঘনত্ব হ্রাস পেত। সুনীতিকুমার বলেছেন যে Sophocles, Euripides প্রভৃতিদের নাটকে দেবী Aphrodite আর শুধুই যৌন প্রেমের দেবী নেই, তিনি বিশ্বম্ভরী বা বিশ্বন্ধরী রূপে চিত্রিত হয়েছেন; এমন কি Goethe-এর 'Faust'-এর শেষ কথা হল

The Woman-soul leadeth us
Upward and on !
(Bayard Taylor-এর অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মতে, এঁদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন, বিশেষ ক'রে উর্বশীর এই সর্বাতিশায়ী সত্তার স্বীকরণে ও রূপায়ণে। তাহলে তো পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবকেই স্ববিরোধী বলতে হয়। তাও না হয় বলা গেল। এ রকম স্ববিরোধী প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসে বিরলবস্তু নয়। কিন্তু প্রশ্নটি হল স্থায়শাস্ত্রের। নিকটে কারণ পেলে আমরা দূরে যাই না; সহজ কারণকে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করি জটিল কারণের চেয়ে। রোমান্টিক চেতনার নানা বিকাশের প্রতীচ্যাগত প্রভাব যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে স্বীকার্য তেমনি এও স্বীকার্য এবং স্বতঃসিদ্ধের মতই স্বীকার্য যে ভারতীয় ঐতিহ্যে তাঁর জন্মগত অধিকার। তাই ভারতীয় শক্তিবাদকে ছেড়ে দিয়ে আমরা Sophocles, Euripides বা Goethe-তে যাবার প্রয়োজন দেখি না, আবার তাঁদের গৌণ প্রভাবও অস্বীকার করি না। ভারতীয় সুফী-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের রেশও মহাকবির সর্বগ্রাসী চেতনায় হয়তো ধরা পড়েছিল। কিন্তু এঁদের সকলেরই পূর্ববর্তী হল ভারতীয় তান্ত্রিক শক্তিবাদ, যা বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে সঞ্চরমাণ ছিল। "উর্বশী" কবিতাতে, পুরুষের যৌন কামনাকে অভ্রংলিহ স্তরে তুলে, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ যৌন-চেতনার সীমাবদ্ধ স্তর একেবারে অতিক্রম ক'রে, বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের আত্মোপলব্ধিকালীন মহাশক্তির সৃষ্টিমুখী জগদ্ধাত্রী রূপের বিকাশে এসে পৌঁছে গেলেন—এ চমকপ্রদ বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কেন না বীরাচারী সাধনার মূল কথাই হল সসীম নারীর মধ্যে সেই মহাশক্তির অধ্যাস দিয়ে শুরু ক'রে পৌঁছাতে হবে চিদ্রূপিণী মহাশক্তিতে। এটা অবশ্য সাধনতত্ত্বের কথা এবং বিনা সাধনায় এই উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু এই সাধনার এবং বিশ্বাসের ঐতিহ্য আমাদের চেতনায়

সুদূরকাল থেকে সঞ্চিত হ'য়ে আছে; তারই সহসা স্ফুরণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, তাঁর অজ্ঞাতে এবং তাঁর সচেতন বিশ্বাসের বিরোধিতা সত্বেও। বীরাচারী বা চীনাচারী তন্ত্র-সাধনার আদিগুরু বশিষ্ট সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। Sir John Woodroffe সে কাহিনী রুদ্রাযামল, ব্রহ্মযামল এবং অন্যান্য তন্ত্র থেকে উদ্ধার করেছেন। ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ ছ হাজার বছর তপস্যা ক'রেও দেবী পার্বতীর দেখা না পেয়ে ক্রোধে অভিশাপোদ্যত হয়ে পিতার কাছে অন্য মন্ত্র যাচ্ঞা করায় ব্রহ্মা বলেছিলেন,

"Oh son, who art learned in the Yoga path, do not do so. Do thou worship her again with whole-hearted feeling, when she will appear and grant you boons. She is the Supreme Śakti. She saves from all dangers. She is lustrous like ten million suns. She is dark blue (নীলা)। She is cool like ten million moons....She is the spouse of Kala (কালকামিনী)। She is the beginning of all. In her there is neither Dharma nor Adharma. She is in the form of all. She is attached to pure Cinācāra (শুদ্ধ চীনাচার-রতা)। She is the initiator of Śaktichakra. Her greatness is infinitely boundless. She helps in the crossing of the ocean of Saṁsāra...She protects the beings of the world. Her action is spread throughout the moving and the motionless...Being entirely engrossed in Her, thou of a surety shalt gain sight of Her."[১২] কিন্তু এর পরেও সহস্র বৎসরের সাধনায় বশিষ্ঠ তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ না করতে পারায় দেবীকে যখন ক্রোধে অভিশাপ দিলেন তখন দৈববাণী হল, "My worship (ধ্যান) is without austerity and pain....My Sādhanā is pure and beyond even the Vedas....Go to Mahachina (তিব্বতে) and the country of the Bauddhas and always follow the Atharva-Veda. Having gone there and seen My Lotus-feet which are Mahābhāva, thou shalt, Oh Maharṣi, become versed in My Kula and a great Siddha."[১৩] তিব্বতে গিয়ে সেখানকার সাধন ও সাধনপদ্ধতি দেখে বশিষ্ঠ বিস্মিত,

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন; মহাদেবকে জানালেন: "Seeing however the way of life (আচার) doubts assail my mind (because he saw the extra-ordinary ritual with wine and women) ...How is it that wine, meat, women are drunk, eaten and enjoyed by naked Siddhas who are high and awe-inspiring. They drink constantly and enjoy (or make enjoy) beautiful women... They are beyond the Vedas...*How can inclinations such as these be purifying to the mind?* How can there be Siddhi without Vaidik rites?"[১৪]

ব্রহ্মযামল তন্ত্রে দেবী যেন এই প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন: "Without Cinācāra you cannot please Me. Go to Vishnu who is Udbodharupi (illumined) and worship Me according to the Ācāra taught by him." Vaśiṣtha then went to Vishnu in the country of Mahācina, which is by the side of the Himālaya, a country inhabited by Sādhakas and thousands of beautiful and youthful women whose hearts were gladdened with wine, and whose minds were blissful with enjoyment (বিলাস)। They were adorned with clothes which inspired love (শৃঙ্গারবেশ) and the movement of their hips made tinkle their girdles of little bells. Free of both fear and prudish shame they enchanted the world. They surround Iśvara and are devoted to the worship of Devi."[১৫] বশিষ্ঠ আবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলে বিষ্ণু বলছেন: "O thou who art devoted to good acts, think not like this. This Ācāra is of excellent result in the Sādhanā of Tāriṇi...By practising it thou shalt not again sink into the ocean of being. It is full of knowledge of the Essence (Tattvajnāna) and gives immediate liberation (Mukti)." Vishnu then goes on to explain a principal feature of this cult, namely, its freedom from the ritual rules of the ordinary worship above

which the Sadhaka has risen.[১৬] এ সাধনা হল আন্তর সাধনা। এতে স্নান, শুদ্ধি, জপ, আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা—সবই মনে মনে। বাহ্যিক কিছুই করার প্রয়োজন নেই। শুভ দিন, অশুভ দিন নেই; দিনে করণীয়, রাত্রে করণীয় ব'লে কিছু নেই। "Devi should be worshipped even though the worshipper has had his food, and even though the place be unclean. Woman who is her image should be worshipped (পূজনম্ স্ত্রিয়াঃ) and never should any injury be done to her (স্ত্রীদ্বেষো নৈব কর্তব্যঃ)"[১৭]. : পার্থিবা-পূজা থেকে মহাশক্তি পূজায় উদগতির এই হল তান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং এর স্থূল ভিত্তি হল কাম—যে কামকে সাধক জয় ক'রে দেবীর কামকলাবিলাস উপলব্ধি করেন।

প্রতীচ্য উর্বশীর ওপর এই প্রাচ্য শক্তিবাদ "উর্বশী" কবিতাতে ক্ষণিকের জন্য আরোপিত হওয়াতে, যে উর্বশী কন্যা, মাতা, বধূ কিছুই ছিলনা সে হ'য়ে উঠল কন্যা, মাতা, বধূ সবই একাধারে, এবং শেষ পর্যন্ত এ সবের ঊর্ধ্বে অনির্বচনীয় এক সম্পর্কে। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে উর্বশী ছিলেন সব কল্যাণকারী সম্পর্কের বিরোধী; এখন চলে গেলেন সব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। এই supra-logical চেতনার স্তরেই কবিতা শেষ হ'তে পারত। কিন্তু এই তুরীয় স্তরের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ স্থায়ী হতে পারলেন না। তাঁর রোম্যান্টিকতা এত তীব্র, এত গভীর যে ঐ কয় পঙ্‌ক্তির চকিত উচ্ছ্বাসের পর তিনি আবার বিলাপে ফিরে গেলেন সেই অপ্সরীর জন্যে—সেই রোম্যান্টিক agony-তে :

সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দু পাতে।

এ হল উর্বশীর অঙ্গে নিখিলের অশ্রুকণা—অপূর্ব অতিশয়োক্তি অলংকার। কবি অবশ্য অশ্রুপাতে কবিতার সমাপ্তি ঘটালেন না, শেষ করলেন আশার অহেতুক প্রলাপে : 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে।' এই আশাই রোম্যান্টিকের উপজীব্য—সে শেলীর *Hellas*-এই হোক, *Prometheus Unbound*-এই হোক, অথবা Wordsworth-এর 'Nature never betrays'-এই হোক।

প্রতীচ্য ধারা আর প্রাচ্য ধারার এই টানাপোড়েন, প্রাচ্য ধারায় স্থিত হবার চেষ্টা আবার প্রতীচ্য ধারায় ফিরে যাওয়া—এই বিচিত্র, জঙ্গম গতিই হল রবীন্দ্র-

কাব্যের এবং রবীন্দ্রমানসের বৈশিষ্ট্য। দুই ধারার দ্বন্দ্ব তাঁর মনে যে আবর্তের সৃষ্টি করেছে, যে আবর্ত থেকে 'উর্বশী' উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই আবর্তের পরিধি এবং গভীরতা অপরিমেয়।

"উর্বশী"তে যে ভাবগুচ্ছের চূড়ান্ত প্রকাশ সেগুলির অংশিক রূপ 'চিত্রা', 'কল্পনা'র বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ না ক'রে, বস্তুমূল ধরে অগ্রসর হ'লে দেখা যায় যে নারীর যে স্ববিরোধী রূপের উৎকট প্রকাশ "উর্বশী"তে ঘটেছে, "নিরুদ্দেশ যাত্রা" জাতীয় কবিতা তারই আর এক বিচিত্র, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপরিচিত, রূপভেদ।

রোম্যাণ্টিক জীবনদর্শন ঃ নারী ঃ মানসী

ছয়

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে কেন এত দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই এই প্রভাবাধীন হয়েছিলেন কেন তার জবাব জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন :

"নিজের মনের এই যে পরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজী সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য-দেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রণ। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা—এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্ততঃ সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্যদীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

"আমাদের সমাজ আমাদের ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়-ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যেই ইংরেজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের

হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে।...য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁসের যুগ আসিয়াছিল, শেক্সপীয়রের সমসাময়িককালের নাট্য সাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।...মানুষ আপনার হৃদয় প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপক রাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

"ইংরেজি সাহিত্যে আর একদিন যখন পোপের কালের ঢিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রণ সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। ...সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে।"

হৃদয়াবেগকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে তাতে নিমজ্জনই তো রোম্যান্টিসিজিমের অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য; তারই আনুষঙ্গিক হল ব্যক্তির প্রাতিস্বিক মূল্যে বিশ্বাস। সে ব্যক্তি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ গ্রাস করিতে চায়—রূপ-রস গন্ধময় পৃথিবী এবং পার্থিব সবকিছুর সঙ্গে সে তাদাত্ম্য লাভ করতে চায় না, সে চায় এই সব কিছুকে আপন বাসনা চরিতার্থ করবার সাধন হিসেবে দেখতে। তার চিত্ত বহির্মুখী বটে কিন্তু সেই বহির্লোক তাকে পেয়ে বসে না, সেই বহির্লোককেই সে পেয়ে বসে হোমারের ইউলিসিস ক্ল্যাসিকাল মনোবৃত্তিদ্বারা চালিত। শুধুই ঘুরে বেড়াতে চান না, ঘুরে বেড়ানোর নেশা তাঁকে পেয়ে বসে নি। গৃহমুখী তাঁর মন পথের অকর্ষণে গৃহকে ভুলে ভবঘুরেমিকেই একান্ত ক রে গ্রহণ করে নি কিন্তু Dante-র *Inferno*তে ইউলিসিসকে এই wanderlust পেয়ে বসেছে। ইউলিসিস স্বীকার করেছেন :

No tenderness for my son, nor piety
To my old father, nor the wedded love

That should have comforted Penelope

Could conquer in me the restless itch to rove
And rummage through the world exploring it,
All human worth and wickedness to prove.

So on the deep and open sea I set
Forth, with a single ship and that small band
Of comrades that had never left me yet.

(Canto xxvi)

এই দেশতৃষ্ণা আর বৈচিত্র্য-তৃষ্ণা রোম্যান্টিকের একই মানসবৃত্তির এপিঠ-ওপিঠ। রবীন্দ্রনাথ একবারে দুই বাহু বিস্তার ক'রে ব'লে ওঠেন :

বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া...
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে...
পূরবে পশ্চিমে।

আবেগের প্রবর্তনায় মূল চেতনাটি অকস্মাৎ অবারিত হয় :

বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—

আবার ছিন্নপত্রে দেখি, প্রায় 'সোনার তরী' রচনার সময়েই লিখেছেন :

"মানুষ কি লোহার কল, যে ঠিক নিয়ম অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ডকারখানা—তার এত দিকে গতি—এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের

গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখ-দুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে।...আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে।" গতানুগতিক সাবধানী চেতনা যাদের ষড়রিপু ব'লে এসেছে, যাদের একমাত্র কাজই হল মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ানো, তারাই কবির মতে মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে। এ মত কোনমতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের অনুবর্তী নয়। এ জাতীয় Pantheism প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক জীবন-দর্শনেরই ভিত্তি; এর মধ্যে চিরকালীন নিবৃত্তিমার্গের অস্বীকৃতিই প্রকট। ইউরোপে এই রোম্যান্টিক দর্শনের মূল প্রবক্তা হচ্ছেন কাণ্ট আর ইংলণ্ডে এই দর্শনের কাব্যময় প্রকাশ ওয়ার্ডস্বার্থ থেকে আরম্ভ ক'রে কম বেশী প্রায় সকল তৎকালীন কবির মধ্যেই। অতি পরিচিত Tintern Abbey কবিতাতেই ওয়ার্ডস্বার্থ প্রবৃত্তিমুখে চিত্তপ্রসারের মাধ্যমে জীবনের মূলীভূত সত্যকে উপলব্ধি করেন :

These beauteous forms
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye...I trust,
To them I may have owed another gift,
Of aspect *more sublime* ; that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened :—that serene and blessed mood,
In which *the affections* gently lead us on—
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul :
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy

We see into the life of things.

ব্রাউনিং ওয়ার্ডস্বার্থের চেয়ে অনেক বেশী লঘুচিত্ত ; কিন্তু তিনিও pantheist এবং তিনিও প্রবৃত্তি-নিয়মিত পথে চ'লেই ঈশ্বরের অভিরুচি পূর্ণ করেন। চিত্তনিরোধ নয়, চিত্তপ্রসারই তাঁরও বাঞ্ছিত :

For pleasant is this flesh ;
Our soul, in its rose mesh
Pulled ever to the earth, still yearns for rest.
Would we some prize might hold
To match those manifold
Possessions of the brute,—gain most, as we did best !

(2)

Let us not always say
Spite of this flesh to-day
I strove, made head, gained ground upon the whole !
As the bird wings and sings,
Let us cry 'All good things
Are ours, nor soul helps flesh more, now, than flesh helps soul !'

.(*Rabbi Ben Ezra*)

ঠিক এই মনোভাবই রবীন্দ্রনাথে প্রকট 'নৈবেদ্যে'র সেই বিখ্যাত, ভারতীয় ঐতিহ্য-বিরোধী অতএব সনাতন ভারতীয় মনের কাছে দুর্বোধ্য, পঙক্তিগুলিতে :

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়॥…
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

তবু রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি যথারীতি মুক্তি কামনায় শেষ করেছেন :

মোহ মোর মুক্তি-রূপে উঠিবে জ্বলিয়া।

কি করে উঠবে ? মোহের এই রূপান্তর কি শুধু 'ভুক্তি'র পথেই আসবে ? কেমন ক'রে, তা ষড়-দর্শন-শাসিত ভারতীয় মন কিছুতেই বোঝে না। সে প্রশ্ন করে এ মুক্তি কি ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অনন্তের দিকে বিকশিত ক'রে তোলা।' কিন্তু ভারতীয় মুক্তির তত্ত্ব বিকাশের ঠিক উল্টো ; সে হল ব্যক্তি-সত্তার বিশ্ব-সত্তাতে

নয়। ভারতীয় মুক্তির তত্ত্ব হল নেতিবাদের তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথে সে চেতনা যে নেই তা নয়। সেটি হল তাঁর মনের ভারতীয় দিক। সে মন বলে :

বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে।

সে মনের সঙ্গে তাঁর রোম্যান্টিক মনের নিরন্তর দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের কোন সমাধান তাঁর কাব্যে শেষ পর্যন্ত হয় নি।

ব্যক্তির চিত্ত-প্রসারের, বাসনাবিস্তারের জন্মগত যে অধিকারে রোম্যান্টিক বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে তার যে চরম মূল্যে, তার যুক্তিপ্রস্থান আগেই বর্ণিত হয়েছে। প্রতীচ্যে এর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন মূলত কাণ্ট। বার্কলে এবং হিউম বিহির্বিশ্বকে অস্বীকার করেছিলেন ; তাঁদের কাছে মনই স্বরাট। বার্কলের ধারণা বহির্বিশ্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেই নাস্তিকতার পথ প্রশস্ত হবে। তাই তিনি হিউমের মত অনুভূতিবাদ (Sensationalism বা empiricism) থেকেই শুরু ক'রে হিউমের অজ্ঞেয়বাদে (agnosticism—নামটি Huxleyর দেওয়া) না পৌঁছে পৌঁছালেন চূড়ান্ত ভাববাদ বা solipcism-এ। দুজনের কেউই বস্তুবিশ্বকে মানলেন না বটে কিন্তু এঁদের দার্শনিক প্রবর্তনার মূল পৃথক পৃথক। বার্কলে মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দার্শনিকদের অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্করণ ; তিনি ছকে ফেলে বস্তুবিশ্বকে নস্যাৎ ক'রে ঈশ্বরসিদ্ধি করতে চান। ঈশ্বরকে সিদ্ধ আর বহির্বিশ্বকে অসিদ্ধ না করতে পারলে জনগণ সেই ডক্টর ফস্টাসের মত বিহির্বিশ্বমুখী হ'য়ে জড়ের ওপর ক্ষমতাবিস্তার করার মোহে একেবারে নরকে যাবে। মানুষকে জড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বার্কলে চোখ বুজে বললেন বহির্বিশ্ব নেই। যা আছে তা সবই চৈতন্য আর সেই খণ্ড-চৈতন্যের সমাধি পূর্ণ চৈতন্যে বা ভগবানে। হিউম বস্তুবিশ্বকেও স্বীকার করেন না, পূর্ণ-চৈতন্য বা ভগবানকেও স্বীকরি করেন না ; তিনি শুধু অনুভূতি এবং মনের কতকগুলি বৃত্তিমাত্র স্বীকার করেন। এঁরা দুজনে জন লকের দর্শনের স্ববিরোধকে দুটি ধারায় চূড়ান্ত পরিণতি দান করেন। এঁরা সকলেই প্রাক্-রোম্যান্টিক যুগের একটি বৈশিষ্ট্যের ধারক : কেউই দুইয়ে দুইয়ে চার করতে পারছিলেন না। মনোবিশ্ব আর বহির্বিশ্বের অঙ্গাঙ্গি-ভাবকে কোন সূত্রের ছকে ফেলে ব্যাখ্যা আর কিছুতেই সমাধা হচ্ছিল না, অথচ এ দুটি জীবনের প্রতিপদেই নিজেদের অঙ্গাঙ্গিত্ব প্রতিপন্ন করছে। একেই বলে সুখ-সাধে চোখে ঠুলি পরা। প্রত্যেক যুগই স্বরচিত ঠুলি চোখে পরে। রেনেসাঁসের দার্শনিক

প্রবক্তা বেকন বস্তুবিশ্বকে স্বীকার ক'রে নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার এবং সিদ্ধ করার পন্থা নির্ধারণেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর Deism ভগবান আর তাঁর সৃষ্টিকে সমভাবে গ্রহণ করতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগের, এবং চার্চ ও আচার-সর্বস্ব, ধর্মের অচলায়তন রেনেসাঁসের যুগে ভেঙেছিল; বেকনের দার্শনিক মতবাদে সেই প্রসারশীল মানবত্মার মর্তমুখে অভিযানের কাহিনী। কিন্তু Reformation আর neo-classicism সেই অভিযানকে নানাভাবে ব্যাহত করল। তাই Grierson তাঁর *Cross Currents in the Literature of the Seventeenth Century*-তে আক্ষেপ করেছেন যে রেনেসাঁসের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারল না ইংলণ্ডে। অন্যত্র বলেছেন "The classicism and Puritanism of the seventeenth century banished romance and the fairies :

> But since of late Elizabeth,
> And later, James came in,
> They never danced on any heath
> As when the time hath bin.
>
> By which we know the fairies
> Were of the old profession,
> Their songs were Ave Maries,
> Their dances were procession,

—*The Background of Eng. Literature*

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কথাটা শুধু fairyদের নিয়ে নয়—কথাটা হল কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে সেই পৃথিবীর দিকে ছুটে যাওয়া যাকে একদিন রূপকথা কিছুটা উন্মোচিত করেছিল আর রেনেসাঁসের যুগে যাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে—একদিকে পর্যটক-অন্বেষকের দল, অন্যদিকে বিজ্ঞান আর দর্শন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে অবশ্য Neo-classicism বা Puritanism রোধ করতে পারল না, কেন না সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে যে আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তার ভিত্তিতেই ছিল ঐ বিজ্ঞান, ঐ দর্শন এবং ঐ বিশ্বপরিক্রমা। বেকনের পরেই হব্‌সের জড়বাদী দর্শন রেনেসাঁসের বস্তুমুখী চেতনাকে এক হিসেবে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিলেও, সে দর্শন যান্ত্রিকতা-দোষ-দুষ্ট হওয়ায়

মানবাত্মার মুক্তি ঘটাতে পারল না। তারপরেই এল বার্কলের প্রতি-আক্রমণ এবং প্রায় যুগপৎ হিউমের অজ্ঞেয়বাদ। কিন্তু এদিকে বিজ্ঞানের এবং তদ্ভিত্তিক উৎপাদনপদ্ধতির এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি চলেছে যে বস্তুবিশ্বকে স্বীকার করা দর্শনের নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। বস্তু আর মনকে তাদের স্ব স্ব মূল্যে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাদের অচ্ছেদ্য সৃষ্টিশীল সম্পর্ক প্রমাণিত করা দর্শনের একান্ত কর্তব্য হলেও সেটি শুদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যকে পুরো মূল্য না দিয়ে, ভাববাদী বা জড়বাদীদের সঙ্গে আপস রফা ক'রে যেটুকু এগোনো যায়, সেইটুকু অগ্রসর হয়ে কাণ্ট শেষ পর্যন্ত Noumenon বা Thing-in-itselfকে দর্শনে অবতারিত করলেন; এইটুকু স্বীকৃত হল যে বস্তুর অন্তর্নিহিত, বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণের অতিশায়ী, কোনও ধর্ম অনুভূতিপুঞ্জের উদ্দীপক; আবার বুদ্ধির অনধিগম্য হলেও সেই মূলসত্তার বোধ মানুষের পক্ষে একেবারে যে অপ্রাপণীয় তাও বলা চলে না। কাণ্ট নিজেই বলেছেন, তাঁর *Critique of Pure Reason*-এ, কেন তিনি Noumenonকে জানার সম্ভাবনা বাতিল করেছেন : "I had to abolish *Knowledge* in order to make room for faith." আমাদের পক্ষে কিন্তু এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই যে, রূপময় বিশ্বের সত্যজ্ঞান কাণ্ট স্বীকার করেছেন; তাকে মায়া ব'লে উড়িয়ে তো দেনই নি, উপরন্তু মন আর রূপময় বহির্বিশ্বকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক ব'লে মনে করেছেন। বিশ্ব-পরিক্রমা এবং বহির্বিশ্বের আত্মীকরণ যে মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম এ কথা বলা মানেই মনের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত পথে চলবার অধিকারই শুধু স্বীকার করা নয়, ঐ পথকেই প্রকারান্তরে একমাত্র পথ ব'লে প্রতিষ্ঠা করা, কারণ Noumenonকে জানা যায় না। জগৎ মায়া তো নয়ই, সে সত্য। মায়াময় জগৎ পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এই প্রচলিত বৈদান্তিক মতকে, এবং এক হিসেবে ভারতীয় আধ্যাত্ম-চেতনার মূলীভূত তত্ত্বকে, রবীন্দ্রনাথ তো ব্যঙ্গ করেছেনই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত; আবার স্বীকার করেছেন যে বিশ্ববৈচিত্র্যকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে তাকে গ্রহণের পথে প্রবর্তনাও তিনি পেয়েছেন প্রতীচ্য থেকে। অবশ্য তাঁর আগেই রামমোহন, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতীচ্যের এই ইহমুখিতায় দীক্ষিত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে চেতনার উনিশ-বিশ থাকা সত্ত্বেও। রামমোহনের বেদান্তকে স্বীকার ক'রেও তেজারতি কারবার করা,

সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে লেখনীধারণ করা আর দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তকে না মেনে ঔপনিষদিক মূলে আসল বেদান্তধর্মের অন্বেষণ—এ দুটিই মূলতঃ নবাগত ইহমুখিতা আর ঐতিহ্যগত তন্মুখিতার দ্বন্দ্বজাত। রবীন্দ্রনাথে এই দ্বন্দ্ব সমাধানে পৌঁছায় নি, শুধু ইহমুখিতার তীব্রতা এবং বিস্তার বেড়েছে। সেইটাই প্রতীচ্য রোম্যান্টিসিজিমের এবং সেই কারণে রবীন্দ্রমানসেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে ছিন্নপত্রে তিনি রেখে-ঢেকে কিছু বলেন নি; তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন সেই বহুযুগাগত টীকা-ভাষ্য শাণিত অবিমিশ্র ভাববাদকে:

"এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্তগ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্য লাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদি কারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মত অত বড় একজন প্রখর বুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়সেন সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা ক'রে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনও সংশয় দূর হয় নি। এক হিসেবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল; কারণ দুইয়ের চেয়ে এক সরল। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আব কিছু নেই। বেদান্ত গর্ডিয়ান গ্রন্থি ছেদন ক'রে দুইয়ে মিলিয়ে এক ক'রে ব'সে আছেন; আর কিছু না হোক, সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই —আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এ কথা মনে স্থান দিতে পারে—আরও আশ্চর্য, এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশী অদ্ভুত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত।...যাই হোক আজকাল সন্ধ্যেবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে, এবং আমি যখন অর্ধ-নিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি এবং স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্তললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলে-ডিঙির যাতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকারমিশ্রিত, সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া

সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে—এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি এ কথা কিছুতে মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া ব'লে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথাযথ মুক্তিরই আনন্দ—অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দরুন দিনের বেলায় আমার যে একটা দৃঢ় বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে; যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ ব'লে অন্তরের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব। এ কথা অতি ঈ-ষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে ব'সে আছি।" (পত্রসংখ্যা ১৪৬; ছিন্নপত্রাবলী)। এর আগে ১৪৩ সংখ্যক পত্রে কবি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক যুগের প্রাণচাঞ্চল্য তাঁকে কী তীব্র আকর্ষণ করে, বিশেষ ক'রে নিজের দেশের নিষ্প্রাণতার বিসদৃশ পটভূমিকায়:

"গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগছে? এটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি, গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জার্মানিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল, হের্ডের, শ্লেগেল, হুম্বোল্ট্, শিলার, কাণ্ট প্রভৃতি বড় বড় চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারিদিকে জেগে উঠেছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই **প্রাণের অভাব** একান্ত মনে অনুভব করি, আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা **সংঘাত** হয় না ব'লে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি, তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনও গঠিত হয়ে ওঠে নি," অথবা জীবনস্মৃতিতে "যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল

সুখ-দুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলাঘরের প্রাণটা কাঁদে।"

মনের স্পর্শ, ভাবজীবনের উজ্জীবন রবীন্দ্রনাথ লাভ করলেন প্রতীচ্য থেকে। ভাবজীবনের সবচেয়ে বড় উপাদান হল ব্যক্তির কল্পনা বা imagination। সেই কল্পনা, অষ্টাদশ-শতকীয় অবজ্ঞা এবং অনাস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে আপন ঐশ্বর্যে বিলসিত হল রোম্যাণ্টিকের কাব্যসৃজনে। আমাদের দেশে ব্যক্তি-সত্তার এবং ব্যক্তি-চেতনার যে স্ফুরণ ঘটল তা সম্পূর্ণত এরই সাগর-পাড়ি-দেওয়া আধ্যাত্মিক স্পর্শে। আমাদের এখানকার স্মৃতিশাস্ত্র রোমন্থন, নব্যন্যায়ের তর্ক-সর্বস্বতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রস-চর্বণার ক্ষয়িষ্ণুতা বা ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যের আধারে আদিরসের সভাশোভন পরিবেষণ, কোন কিছুই এ ভাবোচ্ছ্বাস ঘটাতে সক্ষম ছিল না। এই যে একটি সর্বাবয়ব রোম্যাণ্টিক দর্শন রবীন্দ্রনাথকে অংশত আচ্ছন্ন করল এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ তিনি জীবনস্মৃতিতে করেছেন: "রোম্যাণ্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে, রোম্যাণ্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক।"

এই গতিচাঞ্চল্যের, এই নিছক প্রাণোন্মাদনার অব্যাহত অপরূপ প্রকাশ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'তে। মনের একটি অংশ কল্পনা-বিহারে মত্ত হয় আর একটি অংশ সেই বিহারকে আস্বাদন করে নব নব ভঙ্গীতে। দায়িত্বহীন এই জীবনবিহারে, দ্বিধাহীনা লীলাময়ীই পথ দেখিয়ে চলে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই দুই বিপরীত তত্ত্বের সমন্বয় (a unity of opposites)। তাই পুরুষের নিঃসঙ্গ, অন্তর্মুখী মন, নিজের মধ্যে থেকেই সেই অন্তর্লীনা নারীকে সৃষ্টি ক'রে নেয়। শৃঙ্গার সেইজন্যে আদি রস। এই বিহার-শেষে স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে শ্রেষ্ঠ সহায় হ'ল সঙ্গীতের সুর:

"গুনগুন্ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম, তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখ না মনে, তখনই দেখিলাম, সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া

আছে ; তাহা যেন জল স্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে। সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে, আজও ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ওই গানের পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম,—আমি চিনি গো চিনি, তোমারে, ওগো বিদেশিনী,—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনও বা শুনিয়াছি।" ফলে তারই ইঙ্গিতে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছেন, আশা, খুঁজে পাবেন তাঁর চিরন্তন আবাস :

> হোথায় কি আছে আলয় তোমার
> ঊর্মিমুখর সাগরের পার
> মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণ তলে ?

মনোহারিণীর অনুবর্তনের আরম্ভেও ঐ একই প্রশ্ন :

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
> বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

কিন্তু বিদেশিনী শুধু হাসে, কোন উত্তর দেয় না। সে শুধু হাসি দিয়ে যে মোহ বিস্তার করে সেই মোহ বিস্তার করেছিল পূর্বালোচিত **La Belle dame sans merci**, **Keats**-এর বিখ্যাত কবিতায়, শুধু গানের একটি কলি গেয়ে আর চোখে চুমো খেয়ে। অপরিচিতা নিয়ে চলেছে কবিকে, স্বপ্নবিহারে, বাস্তব জগৎ থেকে বহু দূরে। পরিচিত বাস্তবকে ছেড়ে যেতে কবি বেদনার্ত আর অপূর্ব-পরিচিত লোকে যেতে সংশয় ও শঙ্কা :

> হু হু করে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস।
> অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস।
> সংশয়ময় ঘন নীল নীর,

কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,

শষ পর্যন্ত স্নেহে-উদ্বেগে ভরা এই পরিচিত জগৎকে তাঁরই দিকে প্রসারিত-বাহু ক্রন্দনপরা-র মত মনে হয়

অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।

জগৎ তাঁকে ফিরে আসতে আকুতি জানাচ্ছে আর তিনি চলেছেন, বেদনা এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, অপরিচিতার হিরণ তরণীতে। সকল দুঃখ ছাড়িয়ে সেই যাওয়াতেই আনন্দ। এ হ'ল গিয়ে সেই Yeats-এর 'The Stolen Child' এর বৃত্তান্ত :

Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world is more full of weeping than you can understand.

কিন্তু Yeats-এর faery-রা সত্যিই প্রবঞ্চিকা; Keats-এর faery পলাতকা, আর রবীন্দ্রনাথের অপরিচিতা রহস্যময়ী পার্শ্ববর্তিনী, কিন্তু অপ্রাপণীয়া; তবু নিরাশায় কবি যখন ক্ষোভে ক্লান্তিতে আকুল প্রশ্ন করেন

স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়

তখনও

হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে।

তখন কবি সেই বিদেশিনী অপরিচিতার কাছেই, Keats-এর মতই আত্মসমর্পণ করেন—

শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।

কিন্তু ঘনিয়ে আসা রাত্রির অন্ধকারে তখন বিদেশিনীর সেই হাসিটুকুও আর চোখে পড়ে না। শুধু সে যে আছে এইটুকুই কবির চেতনায় ধরা পড়ে। এবং সেইটুকুই যথেষ্ট।

কবি কি জেনেশুনে মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন? Keats তা মনে করেন নি। Shelley তা মনে করেন নি তাঁর *Alastor*-এ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই কল্পবিহারকে নিছক কাল্পনিক তো মনে করতেনই না, বরং তাঁর কাছে যা সুন্দর

তাই সত্য। সকল রোম্যাণ্টিকের কাছেই তাই। কোলরিজ, ওয়ার্ডস্বার্থ, কীটস্, শেলী সকলেই কবি হিসেবে পৃথক পৃথক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেও, ঐ মত পোষণের ব্যাপারে একেবারে একচিত্ত। কল্পনাকে এই মূল্য দেওয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের একেবারে বিরোধী। আমাদের ষড়দর্শনের কথা তো ছেড়েই দিতে হয়। সাহিত্যে যে রসবাদীরা রসাস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলেছেন তাঁদেরও বক্তব্য নিশ্চয়ই, Wordsworth কবি-কল্পনার যে মূল্য স্বীকার করেছেন, তার সঙ্গে এক নয় : Poetry is the first and last of all knowledge (Preface to the *Lyrical Ballads*). কবি-কল্পনার এই মূল্য স্বীকারই হল, কাণ্ট-নির্দেশিত পথে, রোম্যাণ্টিক দার্শনিক প্রস্থানের চরম কথা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাতত্ত্বের মূলও এইখানেই নিহিত।

উপন্যাস

সাত

'জীবনদেবতা'র বিসম্বাদিত তত্ত্ব বা জটিল ভাবগ্রন্থির উন্মোচনের চেষ্টা করার আগে, নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক ভাবাদর্শের যে স্বতোবিরোধ পূর্বে আলোচিত হয়েছে, উর্বশী এবং অন্যান্য কবিতার সূত্রে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই স্বতোবিরেধ রবীন্দ্রনাথে কি উৎকট রূপ গ্রহণ করেছে তা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, প্রতীচ্যে George Sand, Marcel Proust এবং শেষে D. H. Lawrence, এই বিরোধর বিবর্তন যতটুকু চিত্রিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই সনাতন ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতন-বাসী হয়েও তাঁদের বহু পশ্চাতে ফেলে গিয়েছেন। নারীর মধ্যে কল্যাণী আর মোহিনীর যে অন্যোন্যব্যাঘাতী যুগ্মসত্তা রোম্যান্টিককে শেষ পর্যন্ত আত্মকরুণার (self-pity) প্রবল আবেগে আত্মনাশে প্ররোচিত করেছে ঐ মোহিনীকে অধিকারের ঈপ্সায়, সেই যুগ্মসত্তার ধারণাই আবার নারীর মধ্যেই এই বিরোধের চেতনা আরোপ করেছে—নারী নিজেই নিজের মধ্যে জননী আর প্রিয়ার সংঘাত অনুভব করে, কখনও বা অনুভব করে সহাবস্থান, কখনও বা অপূর্ব দ্বৈতলীলা। Bernard Shaw-এর *Candida* নাটকে নারীর দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে জননীর চূড়ান্ত জয় প্রদর্শিত হয়েছে বটে কিন্তু Shaw দেখাচ্ছেন এই জননী আর প্রিয়া, কল্যাণী আর মোহিনী, লক্ষ্মী আর উর্বশী যখন একজন পুরুষের বদলে একাধিক পুরুষে আপন যুগ্মসত্তার সার্থকতা খোঁজে তখন যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান হল একটি সত্তার বলিদানে। Shaw নিজেকে anti-romantic ব'লে প্রচার করতেন। তাই আদি জননীকে রেখে আদি মোহিনীকে বিসর্জন দিয়েছেন, কেন না সুস্থ জীবনের মূল্য শিল্পের চেয়ে বেশী এবং সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে ঐ ঘরভাঙা অকল্যাণীকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। দৈনন্দিন বাস্তাব জীবনে জননী আর প্রিয়ার সহাবস্থানই ক্ল্যাসিক্যাল ভাবধারায় স্বীকৃত এবং গতানুগতিক দিনযাপনে জননী হন গিন্নী আর প্রিয়া হন দাসী। পুরুষেরও সম-জাতীয় অধোনয়ন ঘটে। তিনিও হয়ে দাঁড়ান ভর্তা বা কর্তা এবং দাস। কালক্রমে গিন্নী-কর্তা সম্পর্কই সর্বগ্রাসী হয়ে স্ত্রী-পুরুষের অন্য সত্তাকে নিগরণ করে। কিন্তু এমন অলক্ষিতক্রমে

এই বির্বতন বা অধোবর্তন ঘটতে থাকে যে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ এই পরির্তনকে লক্ষ্যই করে না। যে ক্ষেত্রে অবশ্য প্রিয়াত্বের আত্যন্তিক অসদ্ভাব থাকে প্রথম থেকেই, সে ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের অঙ্কুরেই বিনাশ হয়—থাকে শুধু ভর্তা আর ভৃত্য, যেমন আবহমান কালের হিন্দু বিবাহে। আমাদের এই বিবাহে নারী আর পুরুষের ব্যক্তিসত্তার কোনও স্বীকৃতিই নেই, আছে শুধু জীবযাত্রাপালনের দায়। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আসার ফলে আমাদের ভাবলোকে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদে যে পরিবর্তন ঘটছিল তার ফলে বিলম্বিত বিবাহ এবং নারীর ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের সুযোগ এবং প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে শাস্ত্রমর্মানভিজ্ঞ অথচ শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া, হিন্দু-বিবাহের আধ্যাত্মিক মূল্যের ধ্বজা-ধারীদের সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন যে, যদি মনুকে নিয়েই টান দিতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের জন্যে হিন্দু-বিবাহের ব্যবস্থা নয়, হিন্দুর বিবাহ একান্নবর্তী পরিবার এবং তদ্ভিত্তিক সমাজের রক্ষার জন্যে—মূলত পুত্রোৎপাদনের জন্যে। সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে মনুর যে শ্লোকার্ধ যত্রতত্র উদ্ধার করা হয়—যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা—রবীন্দ্রনাথ মনুর সেই স্থান থেকেই প্রকরণ উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছেন যে, আসল কথাটা হল নারীর পক্ষে স্বামীর হর্ষোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। কারণ ঐ একই জায়গায় মনু বলেছেন :

> 'যদিহি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
> অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।
>
> (**হিন্দু-বিবাহ**—রবীন্দ্রনাথ)

বিবাহ সম্বন্ধে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রতীচ্য সংস্পর্শের ফল এবং তা যে প্রথম প্রকট হয় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন ; তার যুক্তিও বিস্তার করেছেন এবং শেষে তাকেই কাম্য বলে মেনেছেন :

"বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষার কী প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন, মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ। কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে

-মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

"জীবনের সমুদয় কর্তব্যসাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা, ইহাও ইংরেজি বিবাহের আদর্শ।...যাঁহারা বলেন হিন্দু-বিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনও মানিতে পারি না। হিন্দু-বিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিত মতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না।...স্ত্রী-পুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রতপালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।

"অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরেজিশিক্ষার গুণে এই ইংরেজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয় মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরেজি একীকরণ; আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া, সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরেজি আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই।' (**হিন্দু-বিবাহ**)

কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক এই নূতনতর বিবাহের পক্ষপাতী হলেও এ বিবাহ সম্ভব তখনই যখন নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারিণী। তা না হলে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিধির মত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবজীবনে অপ্রযোজ্য এবং অসার্থক হয়েই থাকে। ফলে বাসনা আর বাস্তবে বাধে নিরন্তর দ্বন্দ্ব রোম্যান্টিকের মনে। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আর নারীর সামাজিক মূল্য, এই দুইয়ের বিরোধ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের মূল উপজীব্য, এমন কি অধুনা-প্রকাশিত তারাশঙ্করের 'শুকসারী কথা'-য় পর্যন্ত। ইংলণ্ডে ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত নারীকে এই দ্বন্দ্বের আধার হিসেবে দেখা গেলেও সেখানে নারীর অবস্থা প্রাচ্যের তুলনায় অনেক বেশী সহনীয়, বিশেষ ক'রে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এবং জাতিভেদের কুপ্রথার অনুপস্থিতি এবং উত্তরাধিকার বিধির নিরপেক্ষতা সেখানে সামাজিক পরিবেশকে এত পঙ্কিল করে নি। ওদের বিবাহ

ব্যাপারেও নীতি ও ধর্মের দিক থেকে নারী আর পুরুষ সমান। মেয়েমানুষের ওখানে খারাপ ভাল দুই-ই হবার স্বাধীনতা আছে প্রচুর। তাই ডিকেন্সের উপন্যাসে Agnes-ও সম্ভব Nancy-ও (*Oliver Twist*) সম্ভব আবার তার বহু আগেই, Nancy-র জনয়িত্রী Moll Flanders-ও (*Moll Flanders*-Defoe) সম্ভব।

শুধু নারীর ব্যক্তি-সত্তার স্বীকৃতির ব্যাপারেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রবেশের সমর্থন রবীন্দ্রনাথে সশ্রদ্ধ আবাহনের মত শোনায়:

"সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাদৃত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখনও জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন—আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে। তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।...

"অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনপণ করিয়াছেন।...

'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও

পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।···

"একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে-দিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আহ্বান হইল ; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল।···

"এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে" (**পূর্ব ও পশ্চিম**)। এর পরেও কি কেউ বলবেন, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য-পাপ-অবিদ্ধ এবং তাতেই তাঁর গৌরব ?

রোম্যাণ্টিক যুগ এবং তারই পরিণতি-পুষ্ট অনুবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের, রবীন্দ্রনাথে, এই সাগ্রহ স্বীকরণ। আরও স্মরণীয় এই যে সেই যুগসন্ধিকালে ফরাসী সাহিত্যের অবাধ আস্বাদনে ঠাকুর পরিবারের বিদগ্ধ আবহাওয়া ফরাসী প্রসূনের গন্ধ-স্নিগ্ধ। Benjamin Constant, Henri Beyle (Stendhal), Balzac, Aurore Dupin (George Sand), Gustave Flaubert, Emile Zola, Maupassant, এমন কি Pierre Loti পর্যন্ত পঠিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মূলেই, অনুবাদে নয়। এই সব ফরাসী ঔপন্যাসিকদের সকলের সম্বন্ধে অবশ্যই স্নিগ্ধ কথাটি ব্যবহার্য নয়। George Sand-এর সঙ্গে Flaubert-এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং ঐ কথাটি যদি বা George Sand দাবি করতে পারেন, ফ্লবেয়ার তো একেবারেই নন। ইংলণ্ডে ঐ সময় Walter Scott-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু নারী সম্পর্কে Scott-এর দৃষ্টিভঙ্গী রোম্যাণ্টিক শুধু একটি অর্থে যে তিনি নারী-পূজক। নারী হয় দেবী, নয় বা মনোহারিণী। নারীর সত্তায় অন্তর্দ্বন্দ্বের তিনি বিশ্লেষণ করেন নি অর্থাৎ নারীর মধ্যে কল্যাণী আর অলক্ষ্মীর অন্তর্বিরোধ, তার নিজেরই প্রাপ্তি আর প্রাপণীয়ের মধ্যে বিস্তার্যমান ব্যবধান, এ সব স্কটকে তেমন ভাবায় নি। অনাস্বাদিতকে কেবল আস্বাদনের ইচ্ছা আর যা পাওয়া গিয়েছে তাতে অতৃপ্তি, রোম্যাণ্টিকের এই যে আপনাকে কেবলই ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছা, কেবলই প্রকৃতির সদাপরিবর্তমান গতিমুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আপন সার্থকতা খোঁজা—নারীর মধ্যে এই

চিত্তবৃত্তির আরোপ করেছেন George Sand এবং Turgenev। এই আরোপ পুরুষের ঐ চেতনার নারীর ওপর প্রক্ষেপ নয়। ঐ চেতনা যদি পুরুষের চিত্তে সহ-জাত হয় তাহলে নারীর চিত্তেও তাই এবং দুইয়ের মধ্যেই ঐ চিত্তবৃত্তি রোম্যান্টি-সিজমের প্রকাশ। প্রতীচ্যে নারী-চরিত্রে রোম্যান্টিসিজমের যে প্রকাশ George Sand-এর প্রথম দিকের উপন্যাসে, তাকে সরল বা naïve বলা চলে। তাঁর নায়িকারা জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবিদার নন; তাঁরা দাবি করেন মানসজীবনে সমান অংশীদারী। ব্যক্তিগত জীবনে George Sand-এর স্বামীত্যাগের পেছনেও বোধ হয় এই রোম্যান্টিক চেতনাই কাজ করেছিল। জীবনে বৈচিত্র্যের তৃষ্ণা, যাকে বলা যেতে পারে নিজেকে নব নব রূপে পাবার ইচ্ছা। এই সব নায়িকার মধ্যে গৃহিণীর উন্মেষই হ'ল না। তাদের জননীসত্তা সম্পূর্ণ চাপা প'ড়ে গেল। তাদের প্রিয়াসত্তার তাড়নাতেই তারা কেবল বলে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা। Flaubert-এ এই মানসিকতার বিকৃত প্রকাশ, যাকে Babbit বলেছেন romanticism walking on all fours. মাদাম বোভারি জীবনের অর্থহীন পৌনঃপুনিকতার মধ্যে আপনার ব্যক্তিসত্তাকে ক্ষয় করতে না চেয়ে জীবনপিপাসায় আর্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্য খুঁজতে গেল নাগর থেকে নাগরান্তরে। রোম্যান্টিক আদর্শকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করতে গিয়ে Flaubert তাঁর নায়িকাকে ক্লেদ-বিলাসে নামালেন, বললেন যেন, 'এই তো তোমার রোম্যান্টিক আদর্শবাদ!' নারীর প্রিয়াসত্তার মক্ষিকাবৃত্তিতে নিম্নায়ন। Zola-তেও এই ফ্লবেয়ারীয় নায়িকার পুনরাবৃত্তি। তবে Zola কোনমতেই নিজেকে রোম্যান্টিক বলতে দিতে নারাজ। তাঁর কথা হল scientific determinism। Taine-এর প্রভাব Zola-তে অতি তীব্র। Nana-তে Zolaর বক্তব্য হল এই যে, আদর্শ-ফাদর্শ ছেড়ে সোজা এই কথাটা বাপু স্বীকার কর যে, মানুষ পরিবেশের এবং প্রবৃত্তির দাস এবং এই মানুষ এমন কিছু আহা-মরি জীব তো নয়ই বরং এক Nana-ই সমগ্র ফরাসী অভিজাত সম্প্রাদায়ের অভিজাত্যের জৌলুষ নিঃশেষে হরণ করে নিতে পারে। এই মনোভাবেরই প্রকাশান্তর হল বোদলেয়ারের প্রকৃতি ভাব-কল্পে—যে প্রকৃতির পুরুষকে গ্রাস ক'রেই আনন্দ। প্রিয়াত্বের অধোগতি এই ধারায় Zola-তে এসে বিরতি লাভ করল, কিন্তু কিছু পরেই রোম্যান্টিক চিত্তবৃত্তির আর একটি সুপ্ত বা এতাবৎকাল উপচীয়মান কিন্তু অপ্রকট ধারা আত্মপ্রকাশ করল Andre Gide ও Marcel Proust-এ। জিদ্-এ একদিকে চূড়ান্ত-

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আর অন্যদিকে তাঁর ধর্ম বা নীতি-চেতনা। তাঁর সম্ভবত প্রথম উপন্যাস *La Porte etroite*-এ নায়িকা নিজের মানুষী প্রেম বা কামকে বলি দিচ্ছে নিজের ধর্মোপলব্ধির বেদীতে। অবশ্য এই উপলব্ধি একান্তই ব্যক্তিগত এবং বিশ্লেষণ করলে এ দ্বন্দ্বও ওই নারীহৃদয়ে কল্যাণী আর অলক্ষ্মীর দ্বন্দ্বের নামান্তর। [জিদ্‌এর বিখ্যাত উপন্যাস *L' Immoraliste*-এ পুরুষের প্রজাপতি-বৃত্তির বৈজ্ঞানিক সমর্থন। স্ত্রী জীবিত থেকে সেই বৃত্তির কর্ষণায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। স্বামীর যক্ষ্মা তাতে সংক্রামিত হয়ে তার কাম্য জীবনান্তটি ঘটলে, স্বামী গুটিপোকা, প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেলেন উত্তর আফ্রিকায় আদিম জীবনের কাননে। এ উপন্যাসে নারী রোম্যান্টিক নায়িকা নয়—পুরুষই Madame Bovaryর স্থলাভিষিক্ত। নারী সম্বন্ধে এ নায়কের কোনও রোম্যান্টিক মোহ নেই।] নারী দ্বিধায় প্রেমিকের কাছে আত্মদানে অসমর্থ। ঠিক এর পরেই আসে Proust-এর *A la recherche du temps perdu* (The Remembrance of Things Past)। রোম্যান্টিক এখানে প্রিয়ার বর্তমানতার চেয়ে অবর্তমানতাই বেশী কামনা করে, কেন না সামনে না থেকে সেই বাঞ্ছিতা তার ভাব-কল্প দিয়ে নায়কের মন ভ'রে রাখে : দৈনন্দিন জীবনের নিরর্থক অকিঞ্চিৎকরতা তার ঔজ্জ্বল্যকে ঢেকে দেয় না। এই মানসিকতাকে Proust-এর Theory of Absence বলা হয়েছে। Proust এই ধারণাকে, মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক ধারা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। Proust-এর আগে Stendhal আর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল Theory of Crystallization। এতদনুসারে মানুষের যেমন সর্বদাই রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা তেমনি সর্বদাই প্রেমসংক্রমণের সম্ভাবনা। কোন বিশিষ্ট প্রেমাস্পদের উপস্থিতির সে-জন্যে কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কেউ উপস্থিত হলেই, গলানো চিনি যেমন সুতোর আশ্রয়ে দানা বেঁধে ওঠে তেমনি মনের সঞ্চিত নিরাধার ভালবাসা সেই ব্যক্তির আধারে কেলাসিত হয়ে ওঠে। Proust-এর প্রেম এতই পরিস্রুত, এতই চৈতন্যসর্বস্ব ও এতই কল্পনানির্ভর যে কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি সে প্রেমের পথে বাধা। দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা শারীরিক অনুপস্থিতি কিংবা ঔদাসীন্য এমন কি সন্দেহ ও অসতীত্ব পর্যন্ত প্রয়োজন Proust-এর প্রেমকে জিইয়ে রাখবার জন্যে। একই সঙ্গে ঘৃণা ও প্রেম, সন্দেহ ও আস্থা, ঈর্ষা ও নিষ্ঠার এই বিচিত্র দোলা Proust-এর আগে ফরাসী সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছিল সুমহান রাসিনের নাটকে। এই উপন্যাসে Proust আবার নিজেই উপস্থিত রয়েছেন

Marcel-এর চরিত্রে। তাতে উপন্যাসখানি হয়েছে আরও কৌতূহলোদ্দীপক। Proust-এর উপন্যাসে রোম্যান্টিসিজমের ধারক কিন্তু নায়ক, নায়িকা নয়।

ইংরেজী উপন্যাসে শিভ্যালরি বা প্রিয়ার দেবীকরণ প্রচুর পাওয়া যাবে কিন্তু আলোচ্য যুগে ইংলণ্ডে নারীসত্তার প্রাগালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের বা নায়কের চিত্তে নায়িকার ঐ অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের প্রতিফলন সুলভ নয়। ফরাসী উপন্যাসে রোম্যান্টিক নায়িকার এই যে বিবর্তন দেখানো হল, এদেশে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং গল্পে সেই বিবর্তনের ধারা রক্ষিত, পরিবর্ধিত এবং তীক্ষ্ণায়িত হয়েছে। কবিতায় নারীর স্ববিরোধী রূপের যে রোম্যান্টিক উন্মোচন দেখা গিয়েছে, গল্পে এবং উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই রূপকে আরও সুবোধ্য, সুসীম এবং বিশিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের কালানুক্রম অনুসরণ না করেও রোম্যান্টিক নায়িকার রূপোদ্ভেদ স্তরে স্তরে অনুধাবন করা যায় এবং পাশ্চাত্ত্য পটভূমিকাটি স্মরণে রাখলে এই বিবর্তনের অনুপ্রেরণার মূল সহজেই ধরা যায়। অবশ্য সব গল্প বা উপন্যাস যে সৃষ্টি হিসাবে সমান সার্থকতা অর্জন করেছে তা নয় কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে সেগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

লক্ষ্মী আর উর্বশীর উপন্যাসে অবতারণ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রেই ঘটিয়েছেন :

"মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।" (বর্তমান psychologyর ভাষায় uterine and clitoritic)

"এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

"ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত ক'রে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

"আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছায় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'দুই বোন' উপন্যাসে শর্মিলা লক্ষ্মী আর ঊর্মিমালা উর্বশী—জননী আর প্রিয়া। ঊর্মির হাতে শর্মির পরাজয়। জীবনে নারীসত্তার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাস্তব প্রয়োজনের চাপে ভোঁতা হয়ে গিয়ে তার ব্যক্তিসত্তারই বিলোপ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তদ্বন্দ্বকে অনুকূল পরিবেশে অতিশয়িত রূপ দিয়ে ট্র্যাজিক সীমা পর্যন্ত নিয়ে

গিয়ে হঠাৎ রাশ টেনেছেন। শশাঙ্কমালির স্পর্শে ঊর্মির'প্রিয়াত্ব প্রখর হয়ে উঠেছিল ব'লেই এ কথা মনে করা সমীচীন নয় যে, তার মধ্যে অন্য প্রবণতাটি নেই। সেটি ছিল বলেই পরিণামে সে আপনাকে সামলেছে। এইখানেই ইউরোপীয় প্রবৃত্তি-মুখী জীবনদর্শনকে রবীন্দ্রনাথ সবলে তাঁর ভারতীয় নিবৃত্তিমুখী বা নিরাতিশয্যের জীবনদর্শন দিয়ে অভিভূত করেছেন এবং এ অভিভবে অবাস্তব বা unrealistic কিছু যে নেই, জীবনে রোজ কি ঘটে, কি আপোসরফাতে জীবন চলেছে তা একটু স্মরণ করলেই উপলব্ধি করা যাবে। আপোসরফাই হল জীবন। জীবনের দাবিতে শর্মি আপোস করল আর ঊর্মির উর্বশী-লীলার অবসান ঘটল। অবশ্য শশাঙ্ক আর শর্মি আর ঊর্মি ঠেকে শিখল যে, সর্বনাশের গহ্বর পায়ের কত কাছে মুখব্যাদান ক'রে আছে। অলক্ষ্মী উর্বশীর নিজর মধ্যে এই পরিচয় পেয়ে ঊর্মিও কি শঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে উঠল না?

উপরে 'দুই বোন' থেকে উদ্ধৃতির চতুর্থ প্যারাগ্রাফে একটি ব্যাপার কিন্তু লক্ষণীয়। তৃতীয় প্যারায় জননীকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অলংকার আছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই, যাথার্থ্য আছে আতিশয্য নেই। এই বর্ণনার মূল কথা সংযম। কিন্তু 'চতুর্থে' প্রিয়াকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন বলে আর শেষ ক'রে উঠতে পারছেন না। জননীর বর্ণনায় শুধু দীপক অলংকার আর প্রিয়ার বর্ণনায় দীপক, সার, কারণমালা এবং রূপক অলংকারের ছড়াছড়ি। জননী শুধু জীবনধারণের প্রচুর উপকরণ দান করেন। তিনি যা দেন তা ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যায়। আর প্রিয়া যা দেন তা অনির্বচনীয়, তা হৃদয়ের মণিকোঠায় স্বর্ণবীণায় ঝংকার-পরম্পরার মাধ্যমে তুলে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় লোকে। বীণাটি স্বর্ণের হলে যে সুরসম্পদ বাড়ে তা নয় তবে প্রিয়াকে সোনার পুতলী ভিন্ন আর কিছু বললে যেন হীনোক্তি করা হয়। রবীন্দ্রনাথে এই প্রিয়া-পক্ষপাত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, কেন না এই পক্ষপাত আছে ব'লেই রবীন্দ্রনাথ এত শঙ্কান্বিত, এত সতর্ক, কেবল নিজেকে সামলে চলেন। এবং অংশত এই কারণেই প্রিয়া-জননী দ্বন্দ্ব তাঁর সৃষ্টিতে এত প্রাধান্য অর্জন করেছে। এটি তাঁর মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য দ্বন্দ্বের একটি দিক মাত্র, কিন্তু অতি বিচিত্র এর জঙ্গম প্রকাশ।

'দুই বোন' আর 'মালঞ্চ' একই স্রোতের দুটি ধারা হলেও সরলা-নীরজা আর শর্মিলা-ঊর্মিমালার সমীকরণ সম্ভব নয়। চারজনের চরিত্রে উপাদানের পার্থক্য এবং কম-বেশী আছে। সে পার্থক্য বিশেষ ক'রে সরলা আর ঊর্মিমালা নামের

মধ্যেই প্রকট। তা ছাড়া উর্মি আর শর্মি যেমন দুটি তত্ত্বের প্রতীক মাত্র, বাস্তব বৈশিষ্ট্যে ন্যূন, সরলা আর নীরজা তা নয়। এরা প্রতীকধর্মিতা ছাড়িয়ে রক্তমাংসের জীব হয়ে উঠেছে, ফলে ঈর্ষা এই উপন্যাসে যেমন সূচিতীক্ষ্ণ রূপ নিয়েছে এমন রবীন্দ্রনাথে আর কোথাও নয়। মূলত কিন্তু সরলা যা বলেছে সেইটিই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কথা। সরলা স্বেচ্ছায় জেলে যাবার আগে আদিত্যকে ব'লে গেল :

"আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

তবু যে সাক্ষাৎকারে সরলা এই কথা আদিত্যকে বলেছিল সেই সাক্ষাৎকারেরই অন্তে আদিত্য সরলার একটি চুম্বন-প্রত্যাশায় চাতকের মত চেয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ:

"পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

"সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।"

এখানে 'পুরুষ' শব্দের ব্যবহারেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। রুগ্ন নীরজার কাছ থেকে আদিত্য এখন আর চুম্বন আশাও করে না, কামনাও করে না। নীরজা মৃত্যুর আক্ষেপের মধ্যেও, যে সরলা বা প্রিয়া বা অলক্ষ্মী তার সংসার গ্রাস করল তাকে, প্রাণপণে ঠেকাতে চায় :

'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মূর্তিমতী অলক্ষ্মী হ'ল বিনোদিনী—পরবর্তী সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের প্রসূতি। শরৎচন্দ্র তো স্বীকারই করেছিলেন যে তিনি 'চোখের বালি' ছত্রিশ বার পড়েছিলেন তবু তাঁর হাতে, বিনোদিনীর কিরণময়ীতে রূপান্তর, শিল্পের অবনয়ন, উন্নয়ন নয়। কিন্তু যুগচেতনা যে অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ শরৎচন্দ্রের sense of waste-এ। বিনোদিনীকে জীবনে স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। তার ব্যর্থ জীবন সমাজের চোখে অপচয় নয় কিন্তু কিরণময়ীর মূল্য স্বীকার না করা যে সমাজেরই ভীরুতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক তা শরৎচন্দ্রে প্রকট। কিরণময়ীকে তাই কাশী পাঠিয়ে সমস্যা মিটোনো যায় না। তাকে পাগল ক'রে দিতে হয়।

বিনোদিনী শুধু প্রিয়া। 'দুই বোনে' প্রিয়াজাতীয় স্ত্রীকে বর্ণনা করতে

রবীন্দ্রনাথ যা যা বলেছেন তার সবই বিনোদিনীতে প্রযোজ্য। মহেন্দ্রের সংসার সে ভাঙে। কিন্তু মহেন্দ্রের নিজের জীবন উল্লাসে উদ্বেগে প্রতীক্ষায় হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। লক্ষ্মী (মেয়ে) আশা প্রিয়ার আক্রমণে পর্যুদস্ত। 'দুই বোনে' উর্মিমালা নিজেই শশাঙ্ককে ছেড়ে যায়, এখানে বিনোদিনীকে ছাড়াতে হয়। তারও কারণ, কালের ব্যবধানে, গ্রাম্য, নিজের অধিকার সম্পর্কে অচেতন, অন্যনির্ভর বিনোদিনীর আধুনিকা, অধিকার-চেতন, স্বপ্রতিষ্ঠ উর্মিতে রূপান্তর। কেউ যদি মনে করেন বিনোদিনীর পূর্বতনী হল গিয়ে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনী তাহলে গোড়াতেই ঘটবে প্রমাদ। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনী নারীসত্তার স্বাভাবিক দিকের প্রকাশ নয় ; তারা বিকৃত। অস্বাভাবিক পরিবেশে বা ব্যক্তিগত দুস্ত্যাজ্য কুরুচির ফলে নারীর ঐ বিরূপতা-প্রাপ্তি। নারীর মধ্যে দুই সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে প্রিয়া-সত্তার ক্ষণে ক্ষণে স্বরাট লাভ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অজ্ঞাত ছিল তো বটেই, তাঁর মনের সনাতনী প্রবণতা এ তত্ত্ব স্বীকারই করতে পারত না। রোম্যাণ্টিসিজমের অকুণ্ঠ প্রকাশের জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাহলে বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান করার মত নিষ্ঠুরতা রবীন্দ্রনাথে সম্ভব হল কি ক'রে? এ হচ্ছে Shakespeare-এর Falstaffকে নিয়ে বা Mercutioকে নিয়ে সেই বিপদের বৃত্তান্ত। চরিত্র আপন বেগে এবং লেখকের আন্তর রসে প্রবৃদ্ধ হতে হতে এমন স্তরে পৌঁছে গেল যে তাকে দেখে লেখক স্তম্ভিত। এ যে অলক্ষ্মীর স্বর্গলাভ হতে চলেছে। অথচ 'চোখের বালি' রচনার সাত বছর পরেই পুত্র রথীন্দ্রনাথের তিনি বিধবা-বিবাহ দিয়েছিলেন। সাত বছর আগে কেন তিনি সাহিত্যে এ ব্যবস্থার সমর্থন করতে পারলেন না? বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর মনোভাবে আর বঙ্কিমের মনোভাবে স্বর্গ-মর্তের দূরত্ব। তিনিই তো ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে তৎকালে অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মহেন্দ্র আর বিনোদিনীর এলাহাবাদ পর্বের চূড়ান্ত মুহূর্তে নিম্নলিখিত কথোপকথনে বিনোদিনীর প্রতীকী অলক্ষ্মী সত্তাকে উদ্ঘাটিত করতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি :

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না—···। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখ।

বিনোদিনী। তাহা জানি; কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না—আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি।…তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন। আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে,…আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

কিন্তু রোম্যান্টিক নায়িকা বিনোদিনী নিজের প্রেমকে মহেন্দ্রের মাধ্যমে Crystallise করার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রান্তরে ধাবমান হল। তার তৃপ্তি নেই অনায়াস-লভ্যকে পেয়ে। কিন্তু সেই বিহারীই যখন এল কাছে তখন বিদ্রোহিণী দুঃসাহসিকা বিনোদিনী তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারল না। অনেকে বলবেন বিধবার সংস্কার কি এত সহজে যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে সমাজের সত্যকে শিল্পরূপ দিচ্ছেন—holds the mirror up to nature. তাই তো মহৎ সাহিত্যিকের কর্তব্য। কিন্তু মহৎ সাহিত্যিক যিনি তিনি অনাগতকেও আবাহন করেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে বীজাকারে দেখা দেয়। সেইজন্যেই তো তিনি দ্রষ্টা। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ স্ফুরণ রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলেন না। সে সম্ভাবনা আজ আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে কল্পনাতেও স্বাগত জানাতে পারেন নি। রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে পত্রে তিনি বলেছেন :

"মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নামতে পারবে না।…যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না।…যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়। কেন না গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাটত কি করে। যদি এ-কথা ঠিক হয় যে, বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে একথা নিশ্চয় যে, মেয়েরা কখনই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না।…যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, এক সময় আসবে যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা, উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমান রূপে ভিড়বে…তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি, আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পারে, বাপ ভাইয়ের আশ্রয়

লঙ্ঘন করতে পারে—কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই।...অতএব আজকাল পুরুষ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।...কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তবেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।...কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যে অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম, তা স্বাধীন ভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম।...প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।...স্ত্রী-পুরুষের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই, মনুষ্যত্ব লাভ করার জন্য স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড় সংকোচ ভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষাসত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়।"

অতএব 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার দেবার অর্থ, রবীন্দ্রনাথের কাছে, একই কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের tug of war করা নয়। ফলে বিধবা-বিবাহ যে একটিমাত্র অবস্থায় সমাজে চলিত হতে পারে সেই অবস্থাটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে কাম্য নয়। কিন্তু বিনোদিনীর বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি ছিল না। বিহারীই প্রার্থী হয়ে এসেছিল, বলা যেতে পারে, তপঃক্লিষ্টা বিনোদিনীর কাছে। কিন্তু বিনোদিনী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বলল:

"কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।...ভুল করিয়ো না। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।"

এ শুধু বিনোদিনীর বিধবা-সুলভ দ্বিধা বা ভীরুতা নয়—শুধু বিহারীর জাত-কুল খোয়াবার ভয় নয়। বিনোদিনীর বক্তব্য হল যে বিবাহের ফলে সেও সমস্ত গৌরব হারাবে। অন্তার্থঃ? এই হল রবীন্দ্রনাথের সেই প্রেম-বিবাহে দ্বন্দ্ব—ভারতীয় আর প্রতীচ্যে দ্বন্দ্ব—classical দৃষ্টিভঙ্গী আর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব।

রোম্যান্টিক নায়িকা বিনোদিনীর ভয়, বিহারী আর সে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একান্ত কাছাকাছি এলে, তাদের মধ্যে সব আড়াল ঘুচে গেলে, বিহারী আর তার মধ্যে প্রিয়াকে খুঁজে পাবে না। প্রিয়ার প্রিয়াত্ব সংরক্ষণের জন্যে বিবাহ অবিধেয়। Proust-এ আমরা দেখেছি প্রিয়ার অনুপস্থিতিতেই বা অসতীত্বেই নায়কের প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ। তার রক্তমাংসের উপস্থিতি কল্প-প্রতিমাকে কেবল আঘাত করে, স্বপ্নকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। Proust-এর নায়কের কিন্তু বিবাহ ঘটেছিল এবং তার পরে প্রয়োজন হয়েছিল নায়িকার অসতীত্বের, নায়কের ঈর্ষার, নায়িকার অনুপস্থিতির, নায়কের সন্দেহের এবং এতজ্জাতীয় আরও অনেক কিছুর। রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে প্রতীচ্য রোম্যান্টিকদের পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে গিয়ে বিবাহকেই অসম্ভব ক'রে তুললেন, আর প্রতি ক্ষেত্রেই নায়িকা বিবাহে অসম্মতি জানাল। অসম্মতি জানাল কিন্তু প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই। **নিজের রাক্ষসী-গ্রাস থেকে, উর্বশী-মায়া থেকে নায়ককে বাঁচাল জননীর মত স্নেহে এবং করুণায়।** উর্বশী-লক্ষ্মী দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসেই (গোরা আর নৌকাডুবি এ আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক) নায়ক-নায়িকার বিবাহ-মিলন অসম্ভব ক'রে তুলল। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিসিজমের এ এক অদ্ভুত প্রকাশ। ভারতীয় ঐতিহ্য, মানুষের স্বাভাবিক মিলন-কামনা, সমাজের দাবী—সব কিছুকে অভিভূত ক'রে দিল রোম্যান্টিকের প্রিয়া-বিরহ-বিলাস। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রেমের পূর্ণতা উপলব্ধি করেন বিরহে, মিলনে নয়:

তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনাবিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে,
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে

মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার।
(পূর্ণতা ঃ পূরবী)

তাই এলা অতীনকে বিয়ে করে না, বলে ঃ

চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।

অতীন—কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?

এলা—আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোট সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি!……মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে, তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না;……নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু! প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।……পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ভারতীয় ঐতিহ্যগত আর একমাত্র প্রেমকেই বাঁচাবার, প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকবার লালসা প্রতীচ্যের রোম্যাণ্টিক দর্শনজাত। প্রিয়াকে বাঁচাবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব; সংসারধর্মের মূল্য, সুস্থ দাম্পত্যজীবনের মূল্য, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাছে গৌণ। তিনি ভীত পাছে 'শুধু দিনযাপনের গ্লানি' প্রেমকে নিষ্পিষ্ট করে। তার চেয়ে চিরবিচ্ছেদই বরং কাম্য। কিন্তু বিবাহে বদ্ধ না হলে, একসঙ্গে জীবনযাপন না করলেই কি এই প্রেম বেঁচে থাকবে?

মানসকুসুমের কি এমন কঠিন বৃন্ত ? তার উত্তর লাবণ্য দিয়েছে :

"মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে
... ...
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;"

কিন্তু তা নয়। শুধু তারই সৃষ্টি তাকে দিলে বিচ্ছেদে এত ব্যথা কেন ? একটু আগেই নায়িকা স্বীকার করেছে :

"কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।"

এই প্রেম তাকে এমন সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে যে পাত্রান্তরে সে নিজেকে তিলে তিলে দান করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। যোগমায়াকে আপন মনের কথা বোঝাতে গিয়ে লাবণ্য স্বীকার করল যে এ প্রেম চিরন্তন না হলেও এর ক্ষণিক সৌন্দর্যই তার কাছে যথেষ্ট :

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন ? সে আমার একটা বিশেষ

জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে, গুটি থেকে বের-হয়ে-আসা দু-চার-দিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে, আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী?"

তাতে আর কিছু নয়, তাতে দুঃখ, তাতে মর্মদাহ। এর ফলে 'করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান' আর একজন। তা ছাড়া আর একজনেরই বা প্রয়োজন হল কেন? এই প্রেমের স্মৃতি নিয়েই তো বেঁচে থাকা যেত। তাহলে কি প্রেম সুস্থ জীবনের পরিপন্থী; প্রেম কি সুস্থ জীবনের মৃত্যু? তাহলে কি আমাদের বোদ্‌লেয়ারের তত্ত্বেই ফিরে গিয়ে বলতে হবে যে প্রকৃতির পায়ে আত্মবলিই প্রেম? উর্বশী আর লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় শান্তি থেকে কত দূরে নিয়ে এল?

এই সূত্রেই মনে আসে D. H. Lawrence-এর বহুখ্যাত উপন্যাস *Women in Love*-এর কথা। Birkin সম্পর্কে তার প্রণয়িনী Ursula-র লাবণ্যের মত দ্বিধা। আবার Lawrence সম্পর্কে বিশেষ ক'রে মনে রাখবার কথা তাঁর জননী-প্রবণতা। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস *Sons and Lovers*-এ নায়ক Paul-এর জীবনে প্রেমে ব্যর্থতার জন্যে দায়ী তার জননী-প্রবণতা। এই উপন্যাসখানি আত্মকাহিনীনির্ভর। Lawrence-এর উপন্যাসে জননী-প্রিয়া দ্বন্দ্ব এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে। কিন্তু *Women in Love*-এ সমস্যার রূপ হল প্রিয়ার জননীসত্তা, নায়কের চরিত্রে ঘর বাঁধবার মত মানসিকতার প্রাচুর্য সম্বন্ধে, সন্দিহান। Birkin অমিতের মত রোম্যাণ্টিক নয়, সে Ursulaকে দেবী বানায় না, তবু তার চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে উৎকেন্দ্রিক, অসাধারণ. স্বমতকেন্দ্রিক হিসেবে প্রতিভাত করে। তাই Ursula-র সমস্যা। Ursula-র সঙ্গে তার বোন Gudrun-এর কথা হচ্ছে। Gudrun বলছে:

"Of course, there is a quality of life in Birkin which is quite remarkable. There is an extraordinary rich spring of life in him, really amazing, the way he can give himself to things. But there are so many things in life that he simply does n't know......In a way he is not clever enough, he is too intense in spots."

"Yes," cried Ursula, "too much of a preacher. He is really a priest."

"Exactly ! He can't hear what anybody else has to say—he simply cannot hear. His own voice is too loud."......

"You don't think one could live with him ?" asked Ursula.

কিন্তু এর পরেই Ursula-র বিপরীত অনুভূতি এবং Birkin সম্পর্কে এই রকম একপেশে ধারণা করার জন্য Gudrun-এর ওপর ঘৃণা। মানুষ কি একটা যন্ত্র নাকি যে তাকে একটা ছকে ফেলে দেবে : "She (Gudrun) finished life off so thoroughly, she made things so ugly and so final...... This finality of Gudrun's, this dispatching of people and things in a sentence, was such a lie." চূড়ান্ত ক'রে দেখা, একেবারে হিসাব ক'ষে ফেলাটা যে একেবারেই ভুল এইটি রোম্যান্টিক লাবণ্য বোঝে না। রবীন্দ্রনাথ এই ভুল এলাকে দিয়ে শোধরাবার চেষ্টা করেছেন 'চার অধ্যায়ে'র শেষ মুহূর্তে। কিন্তু সে তো আসন্ন সঙ্কটসন্ধির দুঃসহ আবেগের আতিশয্যে।

আট

এ আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যতিক্রম বলে মনে হবে 'নৌকাডুবি' 'গোরা' 'যোগাযোগ' এবং 'ঘরে বাইরে'। আসলে কিন্তু নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়ে গল্প গড়েছেন সে সমস্যা তাঁর চেতনাতে আবির্ভূতই হত না, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাঁর মনে শিকড় না গাড়লে। নৌকাডুবি উপন্যাসের "চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞান-জনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।" বঙ্কিমের মনে এমন সমস্যার উদ্ভবের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আবার যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বানাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরও তৎকালীন চেতনায়, হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে এই ভিত-নড়ানো প্রশ্ন জাগা সম্ভব ছিল না। নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং নারীর emancipation—এই দুই ব্যাপারে যে আদর্শবিপ্লব এদেশে ঘটল পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শে তারই সুস্পষ্ট কম্পনজাত এই 'নৌকাডুবি' উপন্যাস 'চোখের বালি'র পরেই লেখা। যে প্রশ্ন নৌকাডুবির মূলে আছে বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সে প্রশ্ন কিন্তু চোখের বালিতেই উঠতে পারত, এবং উঠলে, বিনোদিনীই প্রমাণ করে দিত যে 'স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা'র সংস্কার সাধারণ মেয়ের মন থেকে অনপনেয় নয় এবং সে সংস্কার প্রথম ভালবাসার জালকে, ধিক্কার তো দূরের কথা দ্বিধার সঙ্গেও, ভিন্ন করতে পারে না। নতুন ক'রে নৌকাডুবিতে এই প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পদক্ষেপ করেছেন দ্বিধা-ব্যাহত চিত্তে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি। কমলা আধুনিক মেয়ে নয়, তবু তার মনের স্বামী-সংস্কারকে জিইয়ে রাখতে হল প্রেমের সম্ভাবনাকে নির্মূল ক'রেই; রমেশের সঙ্গে তার জীবন প্রথম থেকেই অস্বাভাবিক। তাই এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যা প্রতিপাদ্য তা প্রতিপাদিত হয় নি; প্রত্যুত হেমনলিনীর ক্ষেত্রে প্রথম প্রেমের অপরাজেয়তাই প্রমাণিত। এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই তো অপেক্ষিত। প্রেমই তাঁর তাবৎ সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য—হয় নারী-প্রেম, নয় ভগবৎ-প্রেম। প্রেমকে যে তিনি এক অন্ধ বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট সংস্কারের চাপে অভিভূত করবেন এ তাঁর কাছ থেকে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নৌকাডুবি উপন্যাস মূলত রমেশের জীবনের প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার কাহিনী।

সে ব্যর্থতা অপরিপক্ক, নমনীয়, তরুণ মনের তীক্ষ্ণতায় অতিশয়িত। দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত যেন Shakespeare-এর *Romeo & Juliet*-এর star-crossed loverদের মত। মানুষের অনায়ত্ত কোনও শক্তির খেয়ালে রমেশের প্রথম প্রণয়ের অকালমৃত্যু, হেমনলিনীরও তাই; নৌকাডুবি রমেশের জীবনের ভরাডুবি। ব্যর্থপ্রেম যে পুরো জীবনকেই ব্যর্থ ক'রে দিল—এ চেতনা একেবারেই ভারতীয় ঐতিহ্যবহির্ভূত, কেন না ভারতীয় জীবন এখনও পর্যন্ত এতখানি ইহমুখী হবার, মানুষকে এতখানি মূল্য দেবার সাহস বা সামাজিক সমর্থন লাভ করে নি। প্রতীচ্যের অভিঘাতে যে চেতনার স্ফুরণ এবং প্রতিকূল পরিবেশে যে চেতনার নিষ্পেষণ সেই চেতনা, স্বাধীন ভাবতবর্ষে, দলীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একনায়কত্বের চাপে, নানা জাতীয় revivalist এবং obscurantist মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে মরতে বসেছে। ভারতবর্ষ তার হাজার বছরের ইতিহাসে সেই humanismকে স্বীকার করতে বা নিজের মধ্যে থেকে উজ্জীবিত করতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ রমেশের জীবনের যে অচরিতার্থতাকে এই প্রথম দিকের উপন্যাসে উপস্থাপিত করলেন সেই অচরিতার্থতাই নানাভাবে 'চার অধ্যায়', এমন কি 'শেষ কথা' ও 'রবিবার' গল্পে পর্যন্ত স্ফুটতর হতে হতে এসেছে। কমলা ও নলিনাক্ষ রবীন্দ্রোপন্যাসেব বিষয়-বিন্যাসের প্রধান ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।

যোগাযোগ উপন্যাসে প্রেম-চেতনার এই ধারাব আরও নিঃসংশয়িত অভিব্যক্তি। নৌকাডুবিতে স্বামীসম্পর্কিত সংস্কারের প্রথম প্রেমের আঘাত সইবার ক্ষমতাকে যদি রবীন্দ্রনাথ পরখ করতে চেয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে যে, যোগাযোগ স্বাধিকারচেতন, আত্মমর্যদা-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আস্থাবতী, রুচিশীলা কোন নারীর জীবনে স্বামী-সম্পর্কিত সংস্কার অর্থাৎ সতীত্বেব আবহমানকালের সংস্কার বিবাহের পরে, প্রেমের অভাবে টিকতে পারে কি না, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নৌকাডুবিতে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঐ সংস্কারের সপক্ষে রায় দিতে পারেন নি বরং ব্যর্থপ্রেমের গ্লানি দিয়ে রমেশের জীবনে অকালরুক্ষতা এনেছেন তেমনি যোগাযোগে তিনি, প্রেমে যার ভিত্তি নেই এমন সতীত্বের জয়গান করতে পারেন নি; তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণই কুমুর ওপরে। কুমুর অবস্থার বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত:

"স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে-ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময়

খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোট ছোট ইশারায়, যখন কিছুই করছে না তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে-মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলো দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মত চারিদিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড় হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।"

তবু কুমুকে যেতে হল শ্বশুরবাড়ি, ভাবী সন্তানের দায়ে। সে বলে গেল, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' এই এমন কিছু হল কুমুর ব্যক্তিসত্তা, মানুষ হিসেবে তার স্বতন্ত্র বিশিষ্ট মূল্য, তার আত্মসম্মানবোধ। এ জিনিস পুরনো সতীত্বের ধারণায় পাওয়া যায় না। কুমু সেই সতীত্বকে কোন মূল্য দিতে রাজী না হলেও দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হন তেমনি কুমুকেও গিয়ে ঘোষাল-বাড়ীর সতী-মা হতে হল। আত্মার সঙ্গে দেহের, মনুষ্যত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বঘাতক আচারের দ্বন্দ্বে আচারেরই হল আপাত-জয়। বাইরের ঠাট ঠিকই বজায় রইল, দেউলে হল শুধু অন্তর। প্রেম আর বিবাহে যে দ্বন্দ্ব 'নৌকাডুবিতে' খানিকটা কৃত্রিম, আকস্মিক ব'লে মনে হয়েছিল 'যোগাযোগে' সেই দ্বন্দ্ব গভীরতর মূলের ইঙ্গিত দিল।

সে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ'রে টান দিয়েছেন। উপরের উদ্ধৃতিতে কুমুর চিন্তার একটা খেই হল, "মধুসূদন তার

জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে-মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্রের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়···।"

কুমুরা ছিল বনিয়াদী বড়লোক; তাই টাকার গরমের বদলে তাদের দেহেমনে লেগেছিল রূপোর স্নিগ্ধতা; টাকার ঝনঝনানির বদলে তাদের ছিল নূপুরের রিনিঝিনি। প্রথমে যে টাকা করে সে শুধু হয় ধনের তল্পীবাহক, যাকে বলে চিনির বলদ। পরের পুরুষেরা সেই ধনের বিচিত্র ব্যবহারে জীবনে স্থূলতা, কুশ্রীতা, কার্কশ্য, রুচিহীনতার বদলে আনে সূক্ষ্মতা, মার্জনা, শোভনতা, সৌকুমার্য। তাই মধুসূদনে যা নেই কুমুতে তাই আছে। এবং কুমুদের পরিবার এখন অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতায় আচ্ছন্ন ব'লে কুমুর এই সবগুণের ওপর একটা মধুর বিষাদের ছায়া পড়েছে। এর সঙ্গে আছে আভিজাত্যের সূক্ষ্ম উন্নাসিকতা। মধুসূদন তার নাগাল পাবে কি ক'রে? তাকে কুমুর ইতর বলে তো মনে হবেই। দুজনের চারিত্রিক সংঘাতের মূলে তাই রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার আর উঠতি ধনিকের দ্বন্দ্ব।

এ হল গিয়ে মূল ধ'রে টান দেওয়া। ব্যাখ্যা একটা আছে ব'লে ঘটনাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না। ভিত্তিতে থাকতে পারে অর্থনীতি কিন্তু উপরে আছে কামনা-ভাবনা-রাগ-দ্বেষ-সমন্বিত ব্যক্তিসত্তা। কুমুর কাছে তার এই বিবাহ নিজের ব্যক্তিসত্তার বলিদান ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে; শ্বশুরঘর করা তার কাছে অপমৃত্যুর সমান; সে বলছে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে ক'রো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা **আমিই একলা মেনে নেব,** ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। **মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না।** আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে **যদি আমি কুমু না হই**?" কথাটা তাহলে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি কুমুকে নিয়ে পুরুষের ভোগ্যা নির্বিশেষ নারীকে নিয়ে নয়, আবহমানকালের আচার-সর্বস্ব সতীকে নিয়েও নয়। সে সতীত্বকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন ঐ প্রতীচ্যের নূতন

আদর্শের বলেই। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাও হিন্দু সমাজের নারীর আদর্শ নয়। আচারগত বিবাহ হবার পরেও সন্দীপের মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তার দুর্বল দিক প্রকটিত যখন হল তখন পরম আত্মগ্লানির মধ্যে দিয়ে সে নিখিলেশকে ফিরে পেল, হয়তো বুঝল নিখিলেশের অ-গান্ধীবাদী রাজনৈতিক আদর্শের মহত্ত্ব ও সত্য মূল্য। সন্দীপ ও বিমলা এই উপন্যাসে শুধু নরনারী-সম্পর্কের স্থূল দিকটি প্রদর্শনের জন্যেই যে চিত্রিত তা মোটেই নয়। এরা দুজনে, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, সেই উচ্ছ্বাস, অসহিষ্ণুতা এবং সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের প্রতীক যা আধুনিক ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এখনও মহৎ গুণ ব'লে স্বীকৃত। সন্দীপের পলিটিক্সই এখনও ভারতের পলিটিক্স আর নিখিলেশ যে রাষ্ট্রনীতি বোঝে সেই রাষ্ট্রনীতিই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি ব'লে তিনি স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে স'রে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিমলার চরিত্রে যে স্থূলতা, যে ভাঙবার উন্মাদনা তা সারা দেশেরই বিপথচালিত রাষ্ট্রনীতির প্রতীক। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যখন সে আত্মস্থ হল তখন নিখিলেশের মানস-সঙ্গিনী সে হল বটে, কিন্তু জীবনে এত ভুল শোধরাবার সময় তো থাকে না। নিখিলেশ তখন আর নেই। এখানেও তাই বিবাহ অসার্থক, তবে তফাত এই যে নিখিলেশ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বিবাহকে সার্থকতা দান করবার, দুটি অন্তরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার এমন দীর্ঘ, অচপল, সহৃদয় আগ্রহ ও প্রয়াস বিশ্বের সাহিত্যে আর কোথাও প্রদর্শিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিখিলেশের চূড়ান্ত একাকিত্ব, তলস্তয়ের হাতে পড়লে, একটি দ্বিতীয় Death of Ivan Ilych গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ ঐ চূড়ান্ত শূন্যতায় বিশ্বাস করেন না। তাই নিখিলেশ শুধু অপেক্ষা করল আর সন্দীপীয় পলিটিক্সের প্রতিবাদে জীবন দিল। এ জীবন-দানেরও আধুনিক ভারতবর্ষে প্রতীকী মূল্য আছে। নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের এই তীক্ষ্ণ রূপায়ণ এবং বিমলার দুর্বলতাকে উদ্ঘাটন ক'রে তবে তাকে আত্মস্থিত করার দুর্জয় সাহস রবীন্দ্রনাথ কখনই সনাতন, এমন কি বঙ্কিমী ঐতিহ্য থেকেও লাভ করেন নি। জীবনের রাশ এমনি ক'রে ছেড়ে দিয়ে তার উদ্দাম রূপটিকে বিকশিত ক'রে তবে তাকে কেন্দ্রস্থ সত্যে ফিরিয়ে আনার দুঃসাধ্য প্রয়াস আমাদের ঐতিহ্যে নেই।

'ঘরে-বাইরে' ছাড়া 'গোরা' একমাত্র উপন্যাস যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রেম আর বিবাহকে শুধু কেবল দুটি ব্যক্তির ব্যাপার হিসেবে দেখেন নি। বিমলাকে নিখিলেশ শুধু ঘরে নয়, বাইরেও পেতে চেয়েছিল; বিমলাকে বুঝতে দিতে চেয়েছিল যে,

সে স্ত্রীলোক ব'লে কেবল ঘরের কূপের মধ্যেই আপন জীবনের মুষ্টিমেয় চরিতার্থতাকে খুঁজে বেড়াবে না, তাকে বাইরেও নিজেকে পেতে হবে। ঘর এবং বাহির নিয়েই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সত্তা বিকশিত। তাকে শুধু ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলে তার ব্যক্তিসত্তা কেবল যে খণ্ডিত হয় তা নয়, সেটি বিকৃত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এখনও বেশীর ভাগ নারীর জীবনই এই অর্থে খণ্ডিত এবং বিকৃত। বাইরে আসার বিপদ অবশ্য আছে কিন্তু সে বিপদ, যে পথ চলতে জানে না, তার পক্ষে। পথের বিপদ আছে ব'লে কেউ যদি পথে বেরনোই বন্ধ করেন তাহলে তাঁকে যেমন নিউরটিক বা স্নায়ুরোগগ্রস্ত বলা হবে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকেও নারীকে সরিয়ে রাখলে তাকেও তেমনি অতিস্পর্শকাতর, স্নায়ুরোগগ্রস্ত ক'রে রাখা হবে। বিমলাকে সহজ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পূর্ণ বিকশিত করতে গিয়ে কিছু বিপদ এল। অনভ্যস্ত আলোকে বিমলার পক্ষে নিজের bearings নির্ণয় ক'রে নিতে কষ্ট হল, দুঃখ হল। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। নারীর emancipation-এর এ তত্ত্ব সম্পূর্ণতই প্রতীচ্যাগত। ঘরে বাইরে পূর্ণ ক'রে বিমলাকে পাওয়া অবশ্য নিখিলেশের হল না, কেন না বৃহত্তর জীবনের সংঘর্ষে সন্দীপেরই প্রথম প্রথম জয়লাভ করে। নিখিলেশের গঠনমূলক জীবনাদর্শের চেয়ে সন্দীপের ভাঙার জীবনাদর্শ সাধারণ মানুষকে বেশী উত্তেজিত করে; শান্তির সক্রিয়, বহু-আয়াস-লভ্য আদর্শকে সার্থক করতে যাওয়ার চেয়ে যেমন চট ক'রে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া অনেক সহজ।

'ঘরে-বাইরের' অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' লিখেছিলেন। সেখানে গোরা প্রেম-ব্যাকুল রোম্যান্টিক নয়। স্বদেশী যুগের অন্ধ দেশপ্রীতি এবং আচার-সর্বস্ব হিন্দুত্বের মোহ থেকে গোরার মোহমুক্ত মানবপ্রীতির স্তরে পৌছানোর ইতিহাস হল এই সুদীর্ঘ উপন্যাস। গোরা যে কেবল nationalism থেকে internationalism-এ পৌছাচ্ছে তাই নয়, সে নেশন-তত্ত্বেরই ঊর্ধ্বে উঠেছে। সুচরিতা তার কাছে এই মোহমুক্তির সদ্যঃপ্রাপ্ত অমৃত ফল। গোরার প্রেমের সার্থকতা তার বৃহত্তর জীবনের সার্থকতারই অংশমাত্র। কিন্তু গোরার এই বিশ্বমানবতা, বিশেষ ক'রে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে যাকে লাভ করা যেতে পারে এমন বিশ্বমানবতা, কি Shelley, তার পরে Goethe, তারপরে Whitman এবং Tom Paine, Godwin, Bentham, Mill, Comte, এমন কি Tennyson-এর 'Parliament of man'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রসূত নয়? এ ছাড়া সাম্যবাদের ইউরোপ-ব্যাপী ভাব-আন্দোলনের বীচিবিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের মনের তটে নিশ্চয়ই এসে

লেগেছিল। ইউরোপের nationalism এখানকার জীবনে শিকড় গেড়ে বসবার আগেই তার সঙ্কীর্ণতায় বেদনার্ত মহাকবি রামমোহনের internationalism-কে আশ্রয় ক'রে এগিয়ে গেলেন 'Parliament of man'-এর দিকে। Tennyson যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসে monarchist ছিলেন তাতে কিছু যায় আসে না। কথা হচ্ছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রভাবের। সবচেয়ে বলবান প্রভাব হল Whitman-এর এবং রামমোহনের মধ্যে দিয়ে আসা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাব।

নরনারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোরা উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, বাইরের সঙ্গে ঘরের বিরোধে এ সম্পর্ক আপন ঐশ্বর্যে বিকশিত হতে পারে না। সুচরিতার সঙ্গে গোরার পরিপূর্ণ আত্মিক সামঞ্জস্যের উপর তাদের মিলন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের জীবনকে অমন ক'রে না দেখলে গোরার পক্ষে এমন সামঞ্জস্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ উপন্যাসের একটা দুর্বলতা হল সুচরিতার বৃহত্তর জীবনের, বাইরের জীবনের অনভিজ্ঞতা। তার গৃহগত সম্পূর্ণতা বাইরে এসে কতখানি টিকবে? **এই সমস্যার অবতারণা এবং চিত্রণ ঘরে-বাইরে-তে।** গোরায় রবীন্দ্রনাথ সুচরিতাকে বাইরে আনেন নি। তখনও তাঁর পলিটিক্স এবং জীবন-দর্শন পুরুষ-কেন্দ্রিক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় তাঁর দৃষ্টিকে এক অভূতপূর্ব উদারতা, স্বচ্ছতা দিল। তারই প্রত্যক্ষ ফল 'ঘরে-বাইরে'।

নয়

কিন্তু এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, উপন্যাসে শুধু নরনারী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রতীচ্যমুখী ; বরং এ কথা মনে করার প্রভূত যুক্তি রয়েছে যে, উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার প্রতীচ্যময়তা সবচেয়ে বেশী প্রকট। যে উপন্যাসগুলির যৌন-সম্পর্কই প্রধান উপজীব্য, যেমন চোখের বালি, নৌকাডুবি, দুই বোন, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ—সেগুলিতেও আর যে একটি জিনিস লক্ষণীয় সেটি হল রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম। সে মানব-প্রীতি শুধু নারীকেই যে নতুন ব্যক্তিমূল্য দিতে চাইছে তাই নয়, সে মানুষমাত্রেরই অধিকারে এবং বাঁচার দাবিতে আস্থাশীল। তাঁর কাছে 'A man is a man for a' that' (কালান্তরে উদ্ধৃত)। এ দাবি এতখানি পরিমাণে বঙ্কিম মানতে পারেন নি ; তিনি রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোস করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এটি একটি প্রধান কারণ। "বাস্তব" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন : "বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেন না স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়।"

রবীন্দ্রনাথও যে এককালে রক্ষণশীল ছিলেন না তা নয়। এ কথা বললে সত্য-ভাষণই হবে যে, প্রথম যৌবনের কিছুকাল তিনি সনাতনীই ছিলেন। সেই কালে তিনি রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে "তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন।" খ্রীষ্টীয় বিপ্লব ঠেকানোই নাকি রামমোহনের প্রধান কীর্তি। সে সময় তাঁর কাছে "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভরতবর্ষেরই ব্রহ্ম।" তিনি যে তারস্বরে মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন ১৮৮২ সনে, তারও মূলে এই প্রথম যৌবনের অতিশয়িত ঐতিহ্য-প্রবণতা। তাঁর মতে মধুসূদন যে অন্যায় করেছেন তার কারণ তিনি ভারতীয় হিন্দুধর্মের আদর্শের মর্যাদা এবং মহত্ত্ব না বুঝে পৌরুষ দম্ভকেই পূজা করেছেন—এমন কি রামায়ণকে বিকৃত করতেও দ্বিধা করেন নি। প্রথম যৌবনের অতিভাষণের পর্যায় অতিক্রম করার পরেও যে তিনি মাঝে মাঝে, যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে, সনাতন প্রাচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি তা নয়। ১৮৯২ সনেই তিনি লিখেছেন :

"আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্য হৃদয় ক্রমশঃ নীরব হ'য়ে আসে; কেবল

কুকুরশাবক পালন ক'রে এবং সাধারণ হিতার্থে সভা পোষণ ক'রে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে।···আমাদের বিধবার নারীপ্রকৃতি কখনও শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অন্তর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনও শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনও অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনও উদাসীন থাকে না।···বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না" (অবশ্য হৃদয় এত ভরা থাকলে কেন যে বিদ্যাসাগর মশাই তাদের দুঃখে এত বিচলিত হয়েছিলেন তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু সে কথা পরে।) তারপর আবার ঐ একই প্রবন্ধে বলেছেন, "এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণ-স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।" [প্রাচ্য ও প্রতীচ্য]

কিন্তু কই সেই সম্পূর্ণাঙ্গী প্রাচ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে? তাঁর উপন্যাসে যারা ভিড় ক'রে এল তারা সকলেই প্রাণোচ্ছল, গতিশীল; তাদের বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিসত্তা, নানাভাবে খণ্ডিত, উদ্বেজিত, ব্যাহত, আবার ক্বচিৎ বা সমাহিত। বৈচিত্র্যময় মানুষের বিচিত্র সত্তার স্বীকরণ পশ্চিমী হিউম্যানিজম্ থেকেই এসেছে—সেই হিউম্যানিজম্ থেকে যা *Measure for Measure*-এর Angeloকে স্বীকার করে, Prosperoকে স্বীকার করে আবার Macbeth, Iagoকেও স্বীকার করে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে শেক্সপীয়রের বিস্তার এবং সর্বগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথে নেই। তিনি শেক্সপীয়রের চেয়ে অনেক বেশী Selective বা বাছবিচার-পরায়ণ। তিনি শেক্সপীয়রের *Othello* সহ্য করতে পারতেন না; ইয়াগোর মত চরিত্র বা *Measure for Measure*-এর Claudio-র জীবনের ঘটনা বা *Pericles*-এর Brothel Scene তিনি আঁকেন নি বা আঁকতে পারেন নি। তবু যে সীমার মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন তা বঙ্কিমী চতুঃসীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাংলা সাহিত্যকে। একদিকে চারুলতা, বিনোদিনী, ললিতা, বিমলা, দামিনী, লাবণ্য, এলা—অন্যদিকে আশা, কমলা, মেজরাণী, বড়ো রাণী, যোগমায়া—আবার হেমনলিনী, সুচরিতা, তার ওপর আনন্দময়ী, বেহারী, নলিনাক্ষ, পরেশবাবু, সন্দীপ বিনয়, অতীন, গোরা, অমিত রায়। জীবনের বহু বৈপরীত্য, বহু অসামঞ্জস্য, অনেক আশা আরও অনেক বেশী ব্যর্থতা দিয়ে গড়া জীবনের রাসলীলা এই

নরনারীর মিছিল। বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্ত-বিষবৃক্ষের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এরা জীবনের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আপনাদের স্থান নির্বাচন ক'রে নিতে চায়, এদের ঐহিকতা ও মর্তপ্রীতি, এদের জীবনতৃষ্ণা এবং চলমানতা—এ সবের কোন ঐতিহ্য প্রাচ্যের সাহিত্যে ছিল না; জীবনেও ছিল না, এল উনিশ-শতকী রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে।

এই জীবনতৃষ্ণার বীভৎস প্রকাশ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে। Ibsenএর ghost-রা মানুষেকে আশ্রয় ক'রেই বাঁচে; তারা heredity বা বংশধারার অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলির ধারক। মানুষের চরিত্র-পরিবর্তনের পথে তারা বাধা। মানুষ তাই নিজেই নিজের শত্রু। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অশরীরীরা অতৃপ্ত মর্তপ্রেমের অস্থিরতায় শুস্তার স্থির জলতলকে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত ক'রে তোলে; তাদের ছায়াসর্বস্ব লাবণ্যবিলাসে পুরনো প্রাসাদ শিহরিত হয়ে ওঠে; তারা মর্তের জীবের প্রাণরসটুকু শুষে নিয়ে এক অদ্ভুত প্রতিজিঘাংসা চরিতার্থ করে। তারা যা পায় নি, যে জীবন থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে তা অন্যেরা কেন ভোগ করবে—এই তাদের দুর্জয় ক্ষোভ। ঐ প্রাসাদের প্রতিখানি পাথর তাদের অতৃপ্ত কামনায়, আক্ষেপে সারা রাত্রি থরথর করে। কোন মানুষ সে প্রাসাদে থাকলে হয় জীবন হারায়, নয় মাথা।

কিন্তু ঐ যে তৃষ্ণার্ত ছায়াগুলি, যারা যে মর্তকে হারিয়েছে তারই জন্যে পাগল, তারা মৃত্যুর পরেও এই মর্তের চেয়ে প্রেয়ান কিছু পায় নি, পাবার আশাও রাখে না। এই মর্তভূমির যে-ক্ষুদ্র অংশটুকুকে তারা চিনেছিল সেই প্রাসাদটুকুকে ঘিরেই তাদের অবিরাম যাওয়া আসা।

যদি বলা যায় ঐ তৃষ্ণাতুর ছায়াগুলি আর কেউই নয়, ওরা যুগযুগান্তের পরিপার্শ্বস্থিত চিরায়মান মানবাত্মা—আমাদের জানিয়ে দিতে চায় যে তারা জীবনে কিছুই পায় নি, শুধু চেয়েছে—চাওয়াটই একমাত্র সত্য, পাওয়াটা নয়; শুধু আর্তনাদ করাই তাদের ভাগ্য। তারা জানিয়ে দিতে চায় যে 'It is an ancient tale of wrong.' ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনী আমাদেরই কাহিনী। আমাদেরই বঞ্চিত, হাত-ফসকে-যাওয়া জীবন আমাদের বহুযুগের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত মনে যে বেদনার আক্ষেপ সৃজন করে 'ক্ষুধিত-পাষণ' তারই কাহিনী। তা যদি না হ'ত তাহলে কেবল প্রেতের নৈশ আবির্ভাবের কাহিনী প'ড়ে আমরা এমন গভীর নাড়া খেতাম না। এ যেন চেকবের সেই "চুমো" গল্পের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ ভাবতীয় পরিবেশে প্রেতের

চুমোতে রূপান্তরিত করলেন। প্রেত—যে কিছুতেই মানুষের জগৎকে পায় না আর মানুষ কিছুতেই মোহিনী ছায়াকে পায় না। চেকবের গল্পে এই পারস্পরিকতা নেই এবং না থাকারও অর্থ আছে। পারস্পরিকতা থাকলে চুমোতেই চুমোর শেষ হত; ঐ একটি ঘটনা জীবনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা এবং লোভনীয়তাকে প্রতিবিম্বিত করতে পারত না।

উনিশ শতকে যখন ধনীগৃহের প্রাসাদের বিলাসের উচ্ছলতায় নির্ধনেরা সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে দিত, যখন সে ঐশ্বর্য ঈর্ষা জাগাত, ঘৃণা জাগাত না, সেই সময়ে ফ্রন্ট থেকে গৃহাভিমুখী, সেই গ্রামে সাময়িক আশ্রয়প্রার্থী একদল সৈনিককে, সেই গ্রামেরই অলঙ্কারস্বরূপ এক অবসৃত জমিদার, একদিন রাত্রে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। নিজেদের সম্বলের মধ্যে যা ছিল তাই প'রে, সুবাসিত হয়ে, সৈনিকেরা বনপথ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে দূর থেকে সেই গৃহের আলোকসজ্জা দেখে, মথের মত উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। উপস্থিত হল এসে সেই প্রসাদের প্রশস্ত নৃত্যকক্ষে—নৃত্য কিন্তু মুখোশপরা। যারা নাচে আগ্রহী নয় তারা, আরও বহু উন্মুক্ত কক্ষের যে কোনটিতে, অন্য যে কোন প্রমোদে, নিযুক্ত হয়ে পড়ে। একজন সাধারণ সৈনিক ঘুরতে ঘুরতে একটি ঘরে এসে দাবাখেলা দেখতে মশগুল। সে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে গিয়ে অসংখ্য ঘরের মধ্যে পথ হারিয়ে এক অন্ধকার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়; দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে পথভ্রান্ত হয়ে। হঠাৎ নারীসজ্জার খসখস শব্দে এবং সৌরভে ঘর ভ'রে যায়। দুটি বাহু সৈনিককে জড়িয়ে ধরে; তার মুখে পড়ে সাগ্রহ চুম্বন। তারপরেই অন্ধকার ঘর থেকে চকিতে সে মেয়েটির অন্তর্ধান।

সৈনিক সারাজীবনের প্রায় অর্ধেক খুঁজেও তাকে আর পায় না; শেষে একদিন সেই শূন্য প্রাসাদের সামনে, শুষ্ক নদীতে এক পুলের ওপর দাঁড়িয়ে, চূড়ান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বোঝে, এর পেছনে ছুটলে পরিণতি হচ্ছে উন্মত্ততা।

'ক্ষুধিত পাষাণে'র নায়কও মরণাপন্ন। অশরীরী মোহিনী আর অন্ধকারে চুম্বনদাত্রী—মূলত এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। চেকবের গল্পের কিন্তু নায়ক-নায়িকা মানুষ ব'লে এবং ঘটনা মানবীয় স্তরে সীমাবদ্ধ ব'লে তাঁর কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট উপস্থাপিত হয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে পরোক্ষ উপায়ে; কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক থেকে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আরও সার্থক। 'ক্ষুধিত পাষাণ' প'ড়ে কি মনে হয় না যে, যে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'মরিতে চাহি না

আমি সুন্দর ভুবনে' অথবা 'প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালবাসিয়াছি' সেই রবীন্দ্রনাথই বলছেন, এ জীবন-পিপাসা যাবার নয়, এ যায় না; অপম্রিয়মান মানবাত্মা শুধু বলতে পারে :

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা। বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

[সেঁজুতি]

মর্ত-কেন্দ্রিক এই বিশ্ববীক্ষা উপন্যাসে যেমন বহুবিপুল চরিত্র সৃষ্টি করেছে, তেমনি করেছে ছোটগল্পে। এমন নিরাসক্তভাবে চরিত্র ও ঘটনাসৃষ্টি বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে বিরল। এই নিরাসক্তিই তো শিল্পীর একান্ত কামনার ধন। যে-শিল্পী বিষয়ের মধ্যে, আপন আবেগের বা বাসনার চরিতার্থতা খোঁজে, সে শিল্পীর চেতনা খণ্ডিত, তার সৃষ্টিও খণ্ডিত, রসাভাস-দুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই impersonality বা অনাসক্তিই তাঁকে দিয়ে সন্দীপ, বিমলা বা মধুসূদনকে সৃষ্টি করিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে যে বিশ্ববীক্ষা আপন বিশাল ছায়া বিস্তার ক'রে ব'সে আছে তা হল 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। মা গৃধ।" এই যে প্রাচ্য চেতনা, যা হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে নিষেধ করে, যা ত্যাগ করতে বলে, **এটি রবীন্দ্রচেতনার মূলীভূত সত্য হলেও, ইহমুখা চেতনার তীব্রতাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে।**

পশ্চিমী ইহকেন্দ্রিক চেতনার শেষ কথা chauvinism নয়, internationalism, কেন না, জাতিবৈর ঐহিক জীবনের শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছানোর পথে বাধা, জাতিবৈর মানবিকতার পরিপন্থী, জাতিবৈর একটা গোটা জাতকে অমানুষ ক'রে দেয়। আবার আক্রমণাত্মক জাতিবৈর ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মাবার সুবিধা না পেলেও, এখানে ছিল এবং এখনও আছে জাতিভেদ, (জাতি কথাটিকে এই আলোচনায় nation বা group বা race যে কোন অর্থে নেওয়া চলে) পারস্পরিক ঘৃণা, এবং চূড়ান্ত অনৈক্য ও স্বাতন্ত্র্য-বিলাস। যদিও ভারতবর্ষে ইউরোপীয় imperialism-এর জন্ম হয় নি তবু এই সব অযৌক্তিক, জীবনদ্বেষী আচারপুঞ্জ মানুষকে মানুষের মূল্য দিতে অস্বীকার করেছে। পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও হিউম্যানিজম্ ভারতীয় জীবনের এই নিষ্ঠুরতা এবং অর্থহীনতা মধু-বঙ্কিমের কাছেই

প্রকট করেছিল ; রবীন্দ্রনাথে এসে, আর কোন আপোসরফার মনোবৃত্তি প্রশ্রয় না পেয়ে, তারা 'গোরা'-তে চূড়ান্ত আঘাত পেল। ভারতবর্ষে পশ্চিমী nationalism জন্মাবার আগেই, এবং পশ্চিমী imperialism-এর কোন সম্ভাবনা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ nationalism, অন্ধ-আচারপরায়ণতা এবং মানবতা-বিরোধী সর্বপ্রকারের সামাজিক ভেদবুদ্ধিকে এক পদক্ষেপে অতিক্রম ক'রে, 'গোরা'-তে এসে পৌঁছালেন। এটি ঘটল ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পরেই এবং রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ ক'রে ফিরে আসবার পর। 'গোরা' উপন্যাসের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ আর কিছুই রেখে ঢেকে বললেন না :

"গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।

গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়চ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"

এর আগেই গোরা পরেশবাবুর কাছে বলেছে, "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ এক নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখছেন। দুঃখের বিষয় এই যে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী হল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজ যেন সত্যিই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

সে ভারতবর্ষকে যে চাইলেই পাওয়া যাবে না, তার জন্যে যে প্রত্যেককে মূল্য দিতে হবে, 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—এ কথা আমরা আজও স্বীকার করছি না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই গান্ধীজীর মত মেলে নি। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের কথা বলতেন, আত্মিক শুদ্ধির কথা বলতেন, মেশিন ছাড়িয়ে চরকা ধরিয়ে স্বরাজ এনে দেবার কথা বলতেন। কিন্তু আত্মিক শুদ্ধির পন্থা যে

অহিংসা, তা কেমন ক'রে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, বিশেষ ক'রে অপর পক্ষেব অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তা লোকে বুঝে উঠতে পারে নি ; তাই চৌরিচৌরা ঘটেছিল। আর চরকা ধরলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না তা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেই প্রমাণিত। ১৯০৫-এর 'বয়কট' আন্দোলনকেও গান্ধীজী পরে প্রয়োগ করেছিলেন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। তাঁরও কোন প্রত্যক্ষ তাৎকালিক ফল দেখা যায় নি। বরং সেই বিলিতি কাপড় পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে নিজেদের যে দুর্বলতা, ঈর্ষা এবং ভাঙবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছিল তাব দিকে বাবে বারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন হঠাৎ কায়দা ক'রে ফললাভ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথেব কাছে এই ফাঁকি দিয়ে ফল পাবার ফাঁকি ধরা পড়েছিল। তাই আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা সেই ফাঁকির চূড়ান্ত মূল্য দিচ্ছি জীবনের সর্বাঙ্গীণ অধোগতিতে। ১৯০৫-এর আন্দোলন থেকে দূবে স'রে এসে রবীন্দ্রনাথ যেমন 'গোরা' লিখলেন আমাদের সঙ্কীর্ণতার আব কূপমণ্ডূকতাব প্রতিবাদে, তেমনি ১৯১৬ সনে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল দুর্বলতাকে বিশ্লেষণ ক'রে লিখলেন 'ঘরে-বাইরে'। 'ঘরে-বাইরে' একদিকে যেমন নরনারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-দর্শনের স্ফুটতর প্রকাশ, তেমনি অন্যদিকে এ হল কংগ্রেস-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল দুর্বলতার উদ্ঘাটন। এবং এ উদ্ঘাটন প্রতীচ্য দৃষ্টিভঙ্গীঅনুপ্রাণিত। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক বক্তব্যটুকু রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে নির্ভীক স্পষ্টতায় প্রকাশ করেছেন :

"আমাদের দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্ম-গ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্ম-শক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এইজন্যে যে-দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে যে কথা বলেছিলেম সে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।...আমি সেদিন দেশকে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ-কিছু নতুন কথা নয়, এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই সকল কথায় দেশের

লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।···এর দুটি মাত্র কারণ; প্রথম—ক্রোধ, দ্বিতীয়—লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল,—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোন আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।'···তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব—হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল।··· তাই তখনকার কালের এক জননেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর এক হাত তার পায়ে।···এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার।··· অন্তঃকরণের জড়তায় যে-ক্ষতি সে-ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না।··· তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। ···আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে-মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল।···সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি;···**কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।···এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক।·· মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদঘাটিত করতে পারে।** স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে; তার সেই জয়পতাকা

আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—**মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।"**

অবশ্য চরকাও আমরা কাটি নি, মেসিনও তখন তেমন চালাই নি। শুধু টুঁটিতে হাত আর পায়ে হাত দিয়েই উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছি। তার ফল যা হবে এবং হচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা আজকের দিনের ভারতবর্ষে হুবহু ঘ'টে যাচ্ছে :

"একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংযুক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যক্রটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে-মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোট, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনও কোনো বড় জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। **আজ পশ্চিম দেশে এই ব্যবসাবুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে।...অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, তারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে।**...আর আমরাই কি কেবল 'পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং' করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব?" (সত্যের আহ্বান, ১৩২৮)।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে 'ঘরে-বাইরে'র সমস্ত তত্ত্বটুকুই বিধৃত এবং রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বীকৃতি প্রমাণ করছে এই সার্বভৌম মানবিকতার দর্শন তিনি ইউরোপ থেকেই পেয়েছেন। যদি কেউ বলেন যে, জনসাধারণকে, বর্তমানকালে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল হিসেবে দেখার শিক্ষা, এদেশের ঐতিহ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথে

সঞ্চারিত হয়েছিল তাহলে আবার রবীন্দ্রনাথেরই কথা উদ্ধার ক'রে দেখাতে হবে যে, ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় নি ; সে মর্যাদা দিয়েছে ইউরোপ এবং আমরাও পেয়েছি ইউরোপ থেকে :

"লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না।...একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের পরিমাণটাই বড় ছিল।"

দশ

জীবনদেবতা নামক ভাবপ্রতিমাটি যে নিছক কবি-কল্পনাধূম নয়, সেটি যে বিজ্ঞানেও গ্রাহ্য—এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে একদা অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয় তৎকালীন ইউরোপীয় জীববিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিন্তু জীববিজ্ঞানে মেণ্ডেলীয় প্রকল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকায়, প্রবন্ধের শেষে, পাদটীকায় তিনি স্বপ্রস্তাব প্রত্যাহার করার প্রয়োজন বোধ করেছেন। পরবর্তী কালে সমালোচকেরা তত্ত্বানুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে কবিকৃতির সহৃদয় চর্বণাকেই মুখ্য কর্তব্য জ্ঞান করছেন। অবশ্য জীবাত্মা-পরমাত্মা থেকে আরম্ভ ক'রে আদর্শ আর বাস্তবের দ্বন্দ্ব অবধি সব রকম antinomy (বৈপরীত্য) নিয়ে নাড়াচাড়া একটু আধটু যে হয় নি তা নয়। হয়েছে, কিন্তু গুরুত্ব না দিয়ে। অনেকে আবার কাব্যের পেছনে তত্ত্ব খোঁজাকে কবিকে দার্শনিক বানাবার অপচেষ্টা ব'লে মনে করেন। কেন না, তাঁরা বলেন, কবি কোনো বিশিষ্ট দার্শনিক প্রস্থানকে ত আর কাব্যমূর্তি দেন না, তা দিতে গেলে সাধারণত কাব্যও হয় না (বোধহয় একমাত্র দান্তে বাদে)। জীবনের বিচিত্র অনুভূতিই কাব্যের উপজীব্য অথচ দর্শনের প্রচেষ্টা হল সেই বৈচিত্র্যকে ঐক্যে সমাহিত করা। তাই কাব্যে জীবনদেবতা ভাবকল্পের যখন যে রকম প্রকাশ ঘটেছে তখন তেমনি ক'রে তাকে আস্বাদন করাই পাঠকের একমাত্র কর্তব্য। চিত্রার 'অন্তর্যামী' কবিতার **কৌতুকময়ী**, 'চিত্রার' **বিচিত্ররূপিণী** বা 'উৎসর্গের' ১০ সংখ্যক কবিতার **বিরহিণী নারী**—কবির একই মৌলিক অভিজ্ঞতার রূপভেদ কি না তা বুঝবার দরকার নেই। এটা কিন্তু হল সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে তাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা। কেন না কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যেও আমরা ঐক্যের সূত্র খুঁজি, বুঝবার চেষ্টা করি তাঁর জীবনদর্শন। সেই জীবনদর্শন দার্শনিকের শুষ্ক, একরেখ, অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ বা অন্য কোনো বাদ নয়, সে হল কবির জীবনকে বুঝবার প্রচেষ্টা থেকে উৎপন্ন, ক্রম-বিস্তারশীল, দ্বন্দ্ব-মুখর অথচ ঐক্যমুখী প্রজ্ঞা। সেটাকে ছকে ফেলা যায় না কিন্তু বোঝা যায় এবং সেটিক না বুঝলে কবিকে বোঝা যায় না। অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কবির যে সত্তাটিকে পাই তার সঙ্গে তাঁর কাব্যময় সত্তার মিল হয় না। কবি নিজেও বোঝেন এই গরমিল কিন্তু এই বিরোধ নিয়েই তাঁকে চলতে হয়। তাঁর জীবনদর্শনে থাকে এই দ্বন্দ্বের ছাপ।

রবীন্দ্রজীবনদর্শনে জীবনদেবতার বিভাবনা একটি কেন্দ্রীয় সত্য। এই সত্যের যদি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতেই হয় তাহলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া যাবে C. G. Jung এর Collective Unconscious এর প্রকল্পে। Jung এর Collective Unconcious এর তত্ত্বের স্বকৃত ব্যাখ্যা শুনলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ এবং Jung একই সত্যের মূর্ত আর অমূর্ত, রূপময় আর তাত্ত্বিক প্রকার-ভেদ মাত্র। Jung তাঁর *Psychology and Literature* প্রবন্ধে, মহৎ সাহিত্যিকের সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যে এই Unconscious এর প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের সীমায়িত অভিজ্ঞতা যে মহৎ কবিদের বিশাল ভাবকল্পের (vision) প্রধান উদ্দীপক নয়, সে উদ্দীপনা যে আসে মগ্ন স্মৃতি বা Unconscious (Collective) থেকে, Jung তারি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, দুই ভিন্নধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রবর্তনার প্রকৃতি নির্দেশ-প্রসঙ্গে। এই ভিন্নধর্মী সাহিত্যের একটিকে তিনি বলেছেন psychological আর একটিকে বলেছেন Visionary : আমরা বলব বাস্তবধর্মী আর প্রতীকধর্মী। Jung বলছেন:

"The phychological mode deals with materials drawn from the realm of haman consciousness—for instance, with the lessons of life, with emotional shocks, the experience of passion and the crises of human destiny in general—al! of which go to make up the conscious life of man, and his feeling life in particular.... I have called this mode of artistic creation *psychological* because in its activity it nowhere transcends the bounds of psychological intelligibility.... The profound difference between the first and second parts of *Faust* marks the difference between the psychlogical and the visionary modes of artistic creation. The latter reverses all the conditions of the former. The experience that furnishes the material for artistic expression is no longer familiar. It is a strange something that derives its existence from the hinterland of man's mind—that suggests the abyss of time separating us, from pre-human ages, or evokes a superhuman world of

contrasting light and darkness. It is a primordial world that surpasses man's understanding, and to which he is therefore in danger of succumbing. The value and the force of the experience are given by its enormity. It arises from timeless depths.... It bursts asunder our human standards of value and aesthetic form. The disturbing vision of monstrous and meaningless happenings that in every way exceed the grasp of human feeling and comprehension makes quite other demands upon the powers of the artist than do the experiences of the foreground of life. These never rend the curtain that veils the cosmos ; they never transcend the bounds of the humanly possible, and for this reason are readily shaped to the demands of art, no matter how great a shock to the understanding they may be. But the primordial experiences rend from top to bottom the curtain upon which is painted the picture of an ordered world, and allow a glimpse into the unfathomed abyss of what has not yet become. Is it a vision of other worlds, or of the obscuration of the spirit, or of the beginning of things before the age of man, or of the unborn generations of the future?... On the strength of this evidence which is furnished by the work of art itself and which throws out of court the question of the poet's particular psychic disposition, we must admit that the vision represents a deeper and more impressive experience than human passion. ......It is not alone the creator of this kind of art who is in touch with the night-side of life, but the seers, prophets, leaders, and enlighteners also. ...The poet now and then catches sight of the figures that people the night-world—the spirits, demons and gods. He knows that a purposiveness outreaching human ends is the life-giving seeret of man." [বাস্তবধর্মী সাহিত্যের কাজ হল মনের সচেতন-

স্তরের সামগ্রী নিয়ে—এই যেমন, জীবনের নানা শিক্ষা, শোক-ঈর্ষা-ঘৃণা ইত্যাদির সংঘাত, প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির বা জীবনের নানা সমস্যার অভিজ্ঞতা —এই সব নিয়েই মানুষের সচেতন জীবন, বিশেষ ক'রে তার অনুভূতির জীবন।··· বাস্তবধর্মী নাম দিয়েছি এইজন্যে যে এর গতি-প্রকৃতি কখনও সচেতন মনের] সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে না।··· ফাউস্ট নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে গভীর পার্থক্য এই দুই ভিন্নধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির পার্থক্যের দ্যোতক। প্রতীকধর্মী সাহিত্য বাস্তবধর্মী সাহিত্যের সকল বিধি-ব্যবস্থার বিপরীতে চলে। যে অভিজ্ঞতা এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু তা সচেতন মনের অপরিচিত, মানুষের সচেতন মনের একেবারে পশ্চাতের অদ্ভুত সামগ্রী—ইঙ্গিত করে কালের সেই অতলস্পর্শ গহ্বরের দিকে যার ওপারে প্রাক্-মানব জীব-পরম্পরার অস্তিত্ব, অথবা হাতছানি দেয় সেই অতিমানবিক জগতের আলো-ছায়ার স্ববিরোধী লীলাকে। এ সেই আদিম, মৌল জগৎ যা মানুষের বুদ্ধির অগোচর ব'লেই মানুষের সহজেই তার শিকার হ'য়ে পড়ার বিপদ আছে। এর আবির্ভাব এত প্রচণ্ড যে এর শক্তি এবং মূল্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এর উদ্ভব সীমা-হীন গভীরতার তল থেকে। এর আবির্ভাবে আমাদের গতানুগতিক মূল্যবোধ আর রূপবোধ দ্বিধাভিন্ন হয়ে যায়। চেতনার অগ্রভূমির (উপরিতলের) অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে রূপ দেবার জন্যে শিল্পীর যে ক্ষমতার প্রয়োজন সেই ক্ষমতা হার মানে সচেতন মানসিকতার অতিশায়ী এই অদ্ভুত, প্রচণ্ড, অর্থহীন, অশান্ত প্রতীকী অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে। একে রূপায়িত করার জন্যে অন্য প্রকারের প্রতিভার প্রয়োজন। চেতনার অগ্রভূমির সামগ্রী কখনও সেই অবগুণ্ঠন ছিন্নভিন্ন করে না যা এই সুশৃঙ্খল জগৎকে ঢেকে রেখেছে; মানবীয় সম্ভাব্যতার সীমাকে এরা কখনও ছাড়িয়ে যায় না। এবং এই জন্যে আমাদের বোধশক্তিকে অতি-মাত্রায় আক্ষেপিত ক'রেও এরা সহজেই শিল্প-রূপ পরিগ্রহ করে। সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ছবি যে পটের ওপরে পড়ে তাকে আতলশীর্ষ ছিন্ন ক'রে দেয় এই আদিম, মৌল অভিজ্ঞতা এবং ক্ষণিকের জন্য উদ্ঘাটিত করে অনাগত ভবিষ্যতের অপরিমেয় গভীরতা। এ কি লোক-লোকান্তরের প্রতিবিম্ব আমাদের মগ্নস্মৃতিতে? না চেতনার মোহগ্রাস, না প্রাক্-মানবীয় যুগান্তরে সৃষ্টির আরম্ভের প্রতিভাস, না এখনও যারা জন্মায় নি তাদের প্রাগাভাস?··· শিল্প-সাহিত্য থেকেই এই যে

সাক্ষ্য পাওয়া গেল এবং যাতে কবির ব্যক্তিগত মানস-সংস্থান অবান্তর ব'লে প্রমাণিত হল সেই শিল্প-সাহিত্য আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সচেতন স্তরের প্রবৃত্তিভিত্তিক যে অভিজ্ঞতা তার চেয়ে এই প্রতীকী অভিজ্ঞতা অনেক বেশী গভীর এবং অনেক বেশী আমাদের নাড়া দেয়।··· জীবনের এই তিমিরাবৃত দিকের সংস্পর্শে শুধু যে কবিই আসেন তা নয়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, ধর্মগুরু, নেতা, জ্ঞানী প্রভৃতিও আসেন।···এই তিমিরাবৃত জগতের মূর্তিগুলির সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে কবি পেয়ে থাকেন—অশরীরীদের, দেব-দানবদের। তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে, মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলতে যা বোঝে তাকে ছাড়িয়েও যে এক বিশালতর উদ্দেশ্য আছে সেইটিই মানবজীবনের গুহাহিত সত্য।]

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে এই সত্যেরই স্বীকৃতি :

খরকণ্টকে ছিন্ন চরণ
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরন,
আশেপাশে হতে তাকায় মরণ
সহসা লাগায় ভ্রম।
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
খেপার মতন কেন এ জীবন,
অর্থ কী তার, কোথা এ ভ্রমণ
চুপ করে থাকি শুধায় যখন—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।

[চিত্রা]

যার বাঁশি শুনে কবি খেপার মত মরণের মুখে ছুটছেন তাকে, অনেকে ভাবতে পারেন, ভগবান বললেই ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হয়ে গেলে কথা থাকত না। চিত্রার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।" রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্পষ্ট ক'রে বলা সত্ত্বেও আমরা তাঁর বক্তব্য এই ব'লে অস্বীকার করতে পারতাম যে নিজের কাব্য সম্পর্কে কবির নিজের বিশ্লেষণ খুব জোর আমাদের বিশ্লেষণের সমমূল্য, তার বেশী নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্পর্কে আমাদের বারে বারে সচেতন ক'রে দিয়েছেন ('কবি যেমন কাব্য তেমন নয় গো' বা 'যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি' বা "সবার আমি সমবয়সী জেনো" ইত্যাদিতে)। তা ছাড়া 'আত্মপরিচয়'—এ জীবনদেবতার পরিচয় হল "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।" এর একটু পরেই আবার বলেছেন, "আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—ওহে অন্তরতম" ইঃ। রবীন্দ্রনাথেরও মনে এই সত্তাকে ভগবান বলতে দ্বিধা কেন?

প্রথমত, এই জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিসত্তায় বিধৃত; অতিশায়িত যা আছে তা কবির ব্যক্তিসত্তারই ভূত বা ভবিষ্যৎকে ব্যেপে—সত্তান্তরে নয়। দ্বিতীয়ত এই জীবনদেবতায় কবি তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার বিলোপ কোনো সময়েই চাচ্ছেন না; বরং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দ্বৈতকেই লালন করতে চাইছেন; আবার বৈষ্ণবের মত তাকে আস্বাদনও করতে চাচ্ছেন না। তৃতীয়ত এবং প্রধানত, এই জীবন-দেবতার সঙ্গে কবির সসীম সত্তার ভক্তির সম্পর্ক নেই, আছে চালক-চালিতের সম্পর্ক। অতএব, প্রতীচ্যের কোনো তত্ত্বের সঙ্গে যদি রবীন্দ্রচেতনায় এই দ্বৈত-লীলার সাযুজ্য খুঁজতেই হয় তা হলে Jung এর Collective unconscious এর প্রাগ্‌বর্ণিত তত্ত্বে যাওয়াই শ্রেয়। কেন না সেখানে ব্যক্তির মধ্যেই তার সমষ্টিগত মগ্নচৈতন্য ক্রিয়াশীল থেকে তাকে আলোড়িত করে যুগযুগান্তের

সঞ্চিত স্মৃতির বিক্ষোভে, তাকে বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতায় অবাখ্যাতব্য অতএব প্রতীকী—উপলব্ধিতে সংক্ষুব্ধ ক'রে, ভবিষ্যৎকে আকস্মিক আলোকে আভাসিত করে—এমন কি তার আদর্শ-চেতনাও নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ এই জীবনের সসীম ব্যক্তিসত্তা তাকে নাগালের মধ্যে পায় না। Jung বিস্তৃততর ব্যাখ্যায় বলছেন :

"We mean by Collective unconscious, a certain psychic disposition shaped by the forces of heredity ; from its consciousness has developed. In the physical structure of the body we find traces of earlier stages of evolution, and we may expect the human psyche also to conform in its make-up to the law of phylogeny. It is a fact that in eclipses of consciousness—in dreams, narcotic states and cases of insanity—there come to the surface psychic products or contents that show all the traits of primitive levels of psychic development. The images themselves are sometimes of such a primitive character that we might suppose them derived from ancient, esoteric teaching. Mythological themes clothed in modern dress also frequently appear.

[সমষ্টিগত মগ্নচৈতন্য বলতে বুঝি বংশধারার শক্তিপুঞ্জের দ্বারা গঠিত একটি মানসিক সংস্থান—এর থেকেই চেতন মনের উদ্ভব। মানব দেহের গঠনে বিবর্তনের স্তরপরম্পরার চিহ্ন বর্তমান। আমরা আশা করতে পারি যে মানবমনের গঠনেও জাতিগত বিবর্তনের নিয়ম কার্যকরী হয়েছে। সত্যই দেখা যায় যে চেতনা যখন আচ্ছন্ন—যেমন স্বপ্নে, নেশাগ্রস্ত এবং উন্মত্ত অবস্থায়—তখন চেতনার উপরিতলে ভেসে ওঠে এমন সব মনোভাব যার মধ্যে আদিমতম স্তরের মানসিক সংস্থানের চিহ্ন প্রকট। ভাবপ্রতিমাগুলি মাঝে মাঝে এমন আদিম রূপ প্রকট করে যে মনে করা যেতে পারে সেগুলি প্রাচীন গোষ্ঠীগত সংস্কারসঞ্জাত। প্রাচীন রূপকথাও মাঝে মাঝে নূতন বেশে আবির্ভূত হয়।]

এই যে heredity এ শুধু মানবীয় নয়, মানবেতর পূর্বপুরুষেরও, এবং Weisman ও Mendel এর মতে উদ্বর্তনের একটি প্রধান অঙ্গ হল উল্লম্ফন অর্থাৎ

আকস্মিকভাবে নূতন প্রজাতির জন্ম। মানুষের মধ্যে তাই রয়েছে সমগ্র প্রাণী জগতের উদ্বর্তনের স্মৃতি : রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যা কিছু অভাবনীয়, তাহা থামকা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। ......নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন।" আধুনিক জীববিজ্ঞান এই বংশ-ধারা এবং এই উল্লম্ফন অস্বীকার করে না এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত Jung এর collective unconscious যুগযুগান্তরেব সঞ্চিত এই স্মৃতির রিক্‌থের ধারক। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে Jungকে গ্রহণ করেছিলেন কি না বলা শক্ত কিন্তু তিনি হার্বার্ট স্পেন্‌সারের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্পেন্সার ডারউইনের তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রয়োগে নিতান্ত আগ্রহী ছিলেন। মানুষের মস্তিষ্ক সম্পর্কে তাঁর মত এই :—মস্তিষ্ক হল

"Organised register of infinitely numerous experiences received during the evolution of life, or, rather during the evolution of that series of organisms through which the human organism has been reached. The effects of the most uniform and frequent of these experiences, have been successively bequeathed, principal and interest, and have slowly mounted to the high intelligence which lies latent in the brain of the infant. Thus it happens that the European inherits from twenty to thirty cubic inches more of brain than the Papuan. Thus it happens that faculties, as of music which scarcely exist in some inferior races, become congenital in superior ones. Thus it happens that out of savages unable to count up to the number of their fingers, and speaking in a language containing only nouns and verbs, arise at length our Newtons and Shakespeares.[১৮] (হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মান্তরবাদে উদ্ধৃত)

এর থেকে Jungএর Collective Uneconscious-এর দূরত্ব মোটে একটুখানি।

আর রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীচ্যের মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন এবং তাই তিনি যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের multiple parsonalityর সমস্যার বিষয়েও সচেতন তা জীবনস্মৃতির নিম্নলিখিত বর্জিতাংশ থেকেও বোঝা যায়ঃ "এখানকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলো মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।··· আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে—যথাসময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।" Jung এর মতে এই বহুব্যক্তিত্ব বা multiple personality-র ব্যাপারের অনেকখানি Collective unconscious এর মাঝে মধ্যে স্মরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই যুক্তিধারা অনুসরণ ক'রে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ভাবকল্পকে ঐ Collective unconscious দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তে পৌছাবার আগে আরও একটু গোড়ার কথা ভাবা দরকার।

ভারতীয় জন্মান্তরবাদে প্রতীচ্যের বিবর্তনবাদ স্বীকৃত। তফাৎ শুধু এই যে, প্রতীচ্যের বিবর্তনবাদ জাতি (race বা species) গত বা দেহগত আর প্রাচ্যের বিবর্তনবাদ জীবগত, কেননা জীবগত না হলে জন্মান্তরবাদে যাওয়া যায় না। তাহলে জন্মান্তরবাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ভাবকল্পের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কি আরও যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয় না?—বিশেষ ক'রে যখন জন্মান্তরে বিশ্বাস যে কোনো ভারতীয়ের জন্মগত এবং রবীন্দনাথ যখন সে বিশ্বাস কখনও বর্জন করেন নি। জাতিগত আর জীবগত বিবর্তনের পার্থক্যটি হীরেন দত্ত মহাশয়ের কথায় বলি ঃ

"পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বলেন, এই যে বিবর্তন, ইহা দেহগত। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, ইহা দেহগত নহে, জীবগত। এ জন্মে জীব ক্রমবিকাশের যে সোপানে উপনীত হয়, সেই উন্নতি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে রক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম জীব উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া থাকে। জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবররাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। জঙ্গমরাজ্যে উপনীত হইয়া প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশুদেহে প্রবেশ করে।

পশুরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্যদেহ ধারণের উপযোগী হয়। মানবের মধ্যেও প্রথম অসভ্য তাহার পর অর্দ্ধসভ্য, তাহার পর সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও তাহার ক্রমবিকাশের শেষ হয় না। মানুষ ক্রমে অতিমানুষ হয়। মানবতার সীমা অতিক্রম করিয়া জীব অবশেষে জীবমুক্ত হয়। ইহাই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য বিবর্তনবাদের সহিত জন্মান্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জীব বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক জন্মে সে উন্নতি করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রায়ই সে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকে, কখনও বা দু এক পদ পিছাইয়াও আইসে। প্রত্যেক জন্মের সংস্কার জীবের মধ্যে সুরক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের সুবিধা ভোগ করে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে কিন্তু বিবর্তনের প্রণালী অন্যরূপ। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক বলেন…যে, প্রাণিজগতে সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। পিতা মাতার জীবিতমানে তাহারা যদি কোন গুণ আয়ত্ত করিয়া থাকে, তবে সন্তানে তাহা সংক্রামিত হয়। ইহাকে বলে উত্তরাধিকার নিয়ম বা Law of Heredity। এই নিয়মে বংশানুক্রমে সন্ততির পর সন্ততিতে সেই গুণ বর্দ্ধমান হইয়া সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে, এইরূপে ধীরে ধীরে বিবর্তন বা Evolution দ্বারা জীবের ক্রমবিকাশ সিদ্ধ হয়।"

অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও মতবিরোধ। এর খানিকটা সমাধান অবশ্য মেণ্ডেলীয় প্রকল্পে হয়েছে। পিতার গুণ, দৈহিক বা মানসিক, যে সন্তানে অনেক ক্ষেত্রেই সংক্রামিত হয় না, এমন কি সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলীর প্রকাশ বহু ক্ষেত্রে ঘটে—এই সত্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেণ্ডেল তাঁর unit character ও gene তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। পরে De Vries, Bateson প্রমুখ জীববিজ্ঞানীরা মেণ্ডেলীয় প্রকল্পের সমর্থনে আরও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। এঁদের আবিষ্কারের ফলে Weisman এর germ cell এর অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্বে আর কেউ আস্থা রাখেন নি। এত সত্ত্বেও কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা পিতা মাতা আর সন্তানের দৈহিক-মানসিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আজও কোনো সর্বব্যাপী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না—বিশেষ ক'রে মানসিক ক্ষেত্রে ত নয়ই। প্রাচ্য প্রজ্ঞান এই সমস্যার উত্তর দিয়েছে জীবের জন্মান্তরবাদের প্রকল্প দিয়ে।

জীবের দেহের এবং মনের গুণাবলীর বিকাশ তার পূর্ব পূর্ব জন্মের অর্জিত গুণের ওপর নির্ভর করে, পিতা-মাতার ওপর প্রধানত নয়। অবশ্য কোন বিশিষ্ট জনক-জননীর সন্তান হিসেবে জীব ভূমিষ্ঠ হবে তাও যেহেতু নির্ভর করে কর্মফলের ওপর, তাই জনক-জননীর দেহমনোগত (psycho-physical) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় ঐতিহ্যগত এই যে জীবের (দেহের নয়) যুগযুগান্ত ধ'রে ক্রমবিবর্তন, এবং সেই বিবর্তনের সঞ্চিত স্মৃতির, (এখানে আর collective unconscious নয়, জীবের unconscious) প্রতিভাধর কবির মানসে স্বত-স্পন্দনই শুধু নয়, জীবের পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনার বাহক গুহাহিত সত্তা হিসেবে তাঁর চেতন মানসে তার আকস্মিক ও বিচিত্র স্ফুরণ, (Jung ও Freud মনের মগ্ন বা unconscious স্তরের অস্তিত্ব ও সচেতন মনের ওপরে তার প্রভাব প্রমাণ করায় এ সম্ভাবনা আজ অনস্বীকার্য) বর্তমানের ব্যক্তিস্বতন্ত্র কবির কাছে যদি জীবনদেবতারূপে প্রতিভাত হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর চিত্রার সূচনায় যে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাকে কবি দুই সত্তার সংঘাত-সমন্বয় হিসেবে দেখেছেন তাকেও এই বংশধারা-সঞ্চিত মগ্ন-স্মৃতির কাছে জীবের সচেতন মনের অভিভব হিসেবেই দেখাও বর্তমান Jungian মনোবিজ্ঞান-সম্মত। কেন না আজ যাকে আমরা আমাদের মধ্যে সত্য, শিব এবং সুন্দরের বোধ ব'লে বর্ণনা করছি সে, Jung এর মনোবিজ্ঞান অনুসারে, বিবর্তনের স্তরে স্তরে উপচীয়মান বাসনা, চিন্তা, কর্ম, ব্যর্থতার স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির বয়সের .ত আর গাছ-পাথর নেই। ব্যর্থতা-সার্থকতার মধ্যে দিয়ে, উচ্চাবচ জীবনের পথ দিয়ে চলতে চলতে এই সঞ্চিত স্মৃতি পরম প্রজ্ঞার স্তরে উপনীত হয়েছে। সেই প্রজ্ঞাতেই উপচিত হয়েছে আমাদের এই জীবনের আদর্শচেতনা। সেই চেতনা যখন বর্তমান বাস্তবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তখন ঘটে দ্বন্দ্ব কিংবা সমন্বয়। মগ্নস্মৃতির প্রজ্ঞা সম্পর্কে Jung যা বলেছেন তাতে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যগত শাশ্বত সত্য, শিব ও সুন্দরের বিভাবনারও ব্যাখ্যা মেলে।

Jung তাঁর *Postulates of Analytical Psychology* নামক প্রবন্ধে বলছেন: "The truth is that the unconscious is always there beforehand as a potential system of psychic functioning handed down by generations of man. Consciousness is a late-born

descendant of the unconscious psyche. It would certainly show perversity if we tried to explain the lives of our ancestors in terms of their late descendants ; and it is just as wrong, in my opinion, to regard the unconscious as a derivative of consciousness. We are nearer the truth if we put it the other way round.

But this was the standpoint of past ages, which always held the individual soul to be dependent upon a world system of the spirit. They could not fail to do so because they were aware of the untold treasure of experience lying hidden beneath the threshold of the transient consciousness of the individual. These ages not only formed an hypothesis about the world system of the spirit, but they assumed without question that this system was a being with a will and consciousness—was even a person—and they called this being God, the quintessence of reality. He was for them the most real of beings, the first cause, through whom alone the soul could be understood. There is psychological justification for this supposition, for it is only appropriate to call divine an almost immortal being whose experience, compared to that of man, is nearly eternal."[১৯]

Jung মগ্ন-স্মৃতির প্রজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে সেই স্মৃতির সূত্রেই ব্যক্তিচেতনায় ভগবানের আবির্ভাবের যুক্তিও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কথায় প্রকট নয় তিনি এই ভগবচ্চেতনা আর খ্রীষ্টীয় ভগবচ্চেতনার সমীকরণ করছেন কি না। কোনো খ্রীষ্টান তা করবে না কেন না খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরবাদ ভারতীয় সোঽহংবাদের বিপরীত—সেখানে জীবাত্মা আর পরমাত্মার প্রভেদ আত্যন্তিক। এ ক্ষেত্রে এই almost immortal being এবং God শেষ পর্যন্ত কোন তত্ত্বে সমাহিত হবেন তা Jung-ই জানেন, কিন্তু আগে দেহের বিবর্তন এবং জীবের বিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন ভারতীয় কর্মবাদনির্ভর জীবের বিবর্তনবাদই রবীন্দ্র-চেতনার ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য

মনে হয়েছিল তেমনি এ ক্ষেত্রেও ভারতীয় জীবনদর্শনের জীব-শিব বা তত্ত্বমসি বা বৈদান্তিক সোঽহং তত্ত্বেরও, রবীন্দ্রমানসের জীবন-দেবতা বিভাবনার দ্বিতীয় স্তরে, উপযোগিতা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। জীবনদেবতা রবীন্দ্রচেতনার প্রথম স্তরে একেবারে কেবল তাঁরই অন্তরদেবতা, আর কারও নয়। শুধু কবির সত্তাকেই তিনি ভর ক'রে আছেন। এই স্তর সম্পর্কে আগেই আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু কবিচেতনার উন্মেষের দ্বিতীয় স্তরে এই জীবনদেবতা, ঠিক, ভারতীয়ের মনে, জীবাত্মার পরমাত্মায় পর্যবসানের মত, বা জীবের শিবত্বে উদ্গতির মত, কখনও বা বিশ্বদেবতায় কখনও বা "নেয়ে"-তে, কখনও বা কর্ণধারে উদ্বর্তিত হয়েছেন। এ যেন আবার সেই উর্বশীর মহাশক্তিতে রূপান্তরণ।

আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।'

দেখার শেষ নেই ব'লেই, রূপের মধ্যে তিনি সীমায়িত নন ব'লেই, রূপ ছাড়িয়ে, মন ও ইন্দ্রিয়দের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাঁকে পেতে গেলে তাঁর আর শুধু কবির জীবনদেবতা হিসেবে কল্পিত হবার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি কখনও রাজা, তাঁর সিংদরজায় কবি ব'সে আছেন; অনেকের যিনি ভিক্ষার ঝুলি ভরেন তাঁর কাছে কবির অনুরোধ তিনি যেন কবির বীণার একটি তন্ত্রী বেঁধে দেন; কখনও বলেন,

এই নিমেষে কেবল তুমি একা
জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা
জীবন জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক।

তিনি এসে প্রদীপ জ্বাললেই ঘর আর চার-দেয়ালের ঘর থাকে না:

যেমনি তব দখিন-পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি,
রেখে দিল আমার গৃহকোণে,
গৃহ আমার এক নিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবন।

তিনি এলে কবির কক্ষে এসে ঢোকে উদার পৃথিবী, কাছে দূরে সব এক হ'য়ে যায়:

কত মাঠের শূন্যপথে

কত পুরীর প্রান্ত হতে,
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে,
কত বনের বায়ুর 'পরে,
এলো চুলের আঘাত ক'রে
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

এখানে জীবনদেবতা কি শুধু কবির জীবনেই বিধৃত? রবীন্দ্রনাথ নিজেই হয়ত বলবেন: পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। এর পরেই যখন উৎসর্গের ৩৯নং এর শেষ স্তবকে, সমাসোক্তি অলংকারের আবরণে ত্রিশূলপাণি মহাদেবকে বলেন,

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে
ললাটে তিলখরেখা
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এসো এসো ভাঙা আলয়ে।

এবং বিশেষ ক'রে শেষের তিন ছত্রে আপন পৃথক সত্তাকে সম্পূর্ণ তদ্গত করবার যে আকুলতা প্রকাশ করেন সেও ত জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর দ্বৈতলীলার ঈপ্সা-সঞ্জাত হতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রেই জীবনদেবতার উদ্বর্তন ঘটছে। 'উৎসর্গে' এই উদ্বর্তনের শেষ স্তর ৪৫ নং (মরণ-মিলন) কবিতা। এখানে জীবনদেবতাকে তিনি উপলব্ধি করছেন মহাকালরূপে। যিনি পুরোনো বন্ধনের জড়তা অপনোদন ক'রে নূতন সার্থকতার পথে নিয়ে

যাবেন ব্যক্তি বা জীবকে। সমগ্র কবিতাটি যেন একটি অতিশয়োক্তি অলংকার—উপমানের দ্বারা উপমেয় একেবারে গ্রস্ত। এ পর্যন্ত যে নানা ভাবে জীবনদেবতাকে খণ্ডশ উপলব্ধি করা গেছে সেই সকল খণ্ডোপলব্ধিকে এক সর্বগ্রাসী উপলব্ধিতে নিলীন ক'রে দিতে গিয়ে মরণ মিলনের যে উদ্বেল ভাবপ্রবাহ এল তাতে কিন্তু জীবনদেবতা বিবাহার্থী মহেশ্বরের ঐতিহ্যগত রূপকল্পে সমাহিত হলেন—ব্যক্তিসত্তার খণ্ড জীবনের অপূর্ণতা, সংশয়, ব্যর্থতা সব কিছুর মৃত্যুতে চরম মিলনের লগ্নে সেই উল্লসিত সত্তা অনুভব করল যে জীবনদেবতা মহাকালেরই খণ্ড-রূপ ব'লে মহাকালেই তাঁর নিধান। এই কবিতার শেষ স্তবকে 'ঈশান' কথাটিতে অপূর্ব শ্লেষালংকার। একদিন কবি ডেকেছিলেন সকলকে :

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ
এসো ওগো এসো মোর হৃদয়নীরে।

আর এখানে, সেই হৃদয়ই, বেলাভূমি সবলে অতিক্রম ক'রে একেবারে কোথায় এসে আপনাকে মিলিয়ে দিলে—

সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে যে পাওয়া তাতে মানুষের তৃপ্তি কোথায়? ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। তাই বিত্তহীন হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ।

এ ত গেল জীবনদেবতা ভাবকল্পের কথা এবং সেই ভাবকল্পের সাংগঠনিক উপাদানের কথা। সেই উপাদান যে মূলত ভারতীয় তাও বোঝা গেল। কিন্তু বোঝা গেল না একটি কথা। মুক্তি আর ভুক্তি-র এই যে টানাপোড়েন, এই যে সংঘাত-সমন্বয় আদর্শে আর দৈনন্দিনে, যুগ্ম-সত্তার এই যে দেওয়া-নেওয়া—এই যে

যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
শ্যামল বসুমতী

আর তার কাছ থেকেই চলে যাবার জন্যে আকুল আগ্রহ

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,

হে পাখা-বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,—
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।

আবার প্রান্তিকে

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্ত্যের প্রান্তপথ
দীপ্ত করে দিক, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়ে যাক
পূর্বসমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচলচূড়ে
অরুণকিরণতলে একদিন অমর্ত্য প্রভাতে

এর চেয়ে স্পষ্টতর

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।...অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল.........
জানিলাম একাকীর ভয় নাই।

তারপরে দ্বিধাহীন ভাষায়,

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারালো প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায়; ক্ষয়ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদিমূল্য তার।
চতুষ্পথে দাঁড়ালো সে ললাটে পণ্যের ছাপ নিয়ে
আপনারে বিকাইতে, অঙ্কিত হতেছে তার স্থান
পথে-চলা সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়।
হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে
আরতিশঙ্খের ধ্বনি যে-লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,

মনে হল, মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশাপ্রত্যাশার কোলাহল। মনে হল,
পরের সুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্ন-মোছা
অসজ্জিত আদিকৌলীন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীতমন্দিরে
একাকার একতারা হাতে। আদিমসৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ-রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদিনির্ঝর তলায়।
বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথিপারে
পূর্বইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—…

অনাশক্তির এই কোটি থেকে আসক্তির বা অনুরাগের একেবারে বিপরীত কোটিতে এই যে দোলক গতি—কৌতুকময়ী বা বিচিত্ররূপিণীর লীলানিকেতন থেকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্-এ প্রয়াণের এই যে বাসনা, উপনিষদের ভাষায় একে নিঃশ্রেয়স আর প্রেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে। কখনও বা কবি এই অনাসক্তির প্রবণতাকে ধিক্কার দিয়ে ওঠেন :

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।
ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।

শুধু ধিক্কার দিয়ে ওঠেন না, তাকে 'বিকার' আখ্যা দেন, অথচ তার স্ফুরণকে ঠেকাতেও পারেন না। যম কঠোপনিষদে নচিকেতাকে বলেছিলেন,

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

[শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয় গ্রহণ করে কেন? উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিভক্তরূপে —পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া···প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃ কেই গ্রহণ করেন।·· শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ] ভারতীয় জীবনদর্শন এই শ্রেয়েরই পক্ষপাতী, সে জীবনদর্শনে বিত্তের চেয়ে অমৃতের মূল্য বেশী। তাই ভারত চার্বাকীয় দর্শনকে ত লুপ্ত ক'রে দিয়েছেই, বেদের কর্মকাণ্ডকেও অনাদরণীয় ক'রে আত্মজ্ঞানের নিলয় উপনিষৎ-কেই প্রাধান্য দিয়েছে। এ কথা ব'লে ব্যঙ্গ ক'রে লাভ নেই যে, আদর্শে ভারতবাসী মুমুক্ষু হয়েও বাস্তবে 'বড়বাজার'-কেই সার করেছে। এ ব্যঙ্গ এইটুকু প্রমাণ করে যে আদর্শ আর বাস্তবের বিরোধ এখন তীক্ষ্ণতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আদর্শ আছে ব'লেই দ্বন্দ্ব আছে। একই মানুষের মধ্যে গৃধ্নুতা আছে আবার বৈরাগ্যও আছে। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে উন্নীতই করছে। ফ্রেয়েডের ভাষায় এ হল স্রেফ adjustment এবং sublimation। কিন্তু প্রেয়কে চূড়ান্ত না মনে করলে ফ্রয়েড আসতে পারেন না। ভারতীয় জীবনদর্শন, যা রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা হল ঈশোপনিষদের সেই প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্। এই একান্ত অনাসক্তির দর্শনকে জীবনে অঙ্গীকার করা অতি দুষ্কর ব'লে এই দর্শনকে হেয় করার সাহস বা তাকে ধিক্কার দেবার সাহস, রবীন্দ্রনাথের মত ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট মনের পক্ষে যে সম্ভব হল, তিনি যে একে বিকার ব'লে দূরে সরিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলেন,

> গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
> বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
> মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

এ শুধু সেই ইহমুখিতার জোরে যা তিনি, আপন স্বীকৃতি অনুসারেই, প্রতীচ্যের কাছ থেকে পেয়েছেন। বিচিত্রকে ভালোবাসার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই তাঁর জীবনদেবতা নারীরূপিণী—পুরুষের কাছে নারীই সকল বৈচিত্র্যের সার

—রেনেসাঁসের পর থেকে আজও পর্যন্ত। মাঝে মাঝে যখন জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা হয়ে ওঠেন তখন মহাকাল, বিশ্বেশ্বর ইত্যাদি রূপকল্পেরও আবির্ভাব ঘটে। সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ইহমুখিতাই রবীন্দ্রনাথকে করেছে শ্রেষ্ঠ রূপকার। বৈচিত্র্যেই, বিশেষেই ত রূপ; নির্বিশেষ অরূপ, অমূর্ত। ভাব থেকে রূপে অবিরাম আসাই হল কবির কৃতি। সেই সসীম রূপের মধ্যে অসীমকে 'ধ্বনিত' বা 'ব্যঞ্জিত' করাই হল আবার রোম্যান্টিকের কাজ। এক হিসেবে তাই রোম্যান্টিক অত্যন্ত ইহমুখী। সে ইহের মধ্যেই ইহাতীতের সন্ধান পেতে চায়। তাই সে কোনো প্রকারের pantheism বা সর্বেশ্বরবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারে সহজে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই ইহমুখিতার আরম্ভ মধুসূদনে আর তার রোম্যান্টিক পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। এবং তাঁর সমগ্র কাব্যের মূলসূত্র হল এই প্রতীচ্যাগত ইহমুখিতা আর প্রাচ্যের তন্মুখিতা, মানবকেন্দ্রিকতা আর ভগবৎ-কেন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব। 'প্রান্তিকেও' এর সমাধান নেই। সমাধান হওয়া সম্ভবও ছিল না, কেন না এই দ্বন্দ্বেই কবি-স্বরূপটি আধৃত। তিনি যদি রূপকে, বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারতেন তাহলে আর কবি হওয়ার দায় থাকত না। আবার লয় বা মুমুক্ষার তত্ত্বে কোনো আস্থা না থাকলে তিনি এই রূপকে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে নিরীক্ষণ করার মত স্থৈর্য এবং নৈর্ব্যক্তিকত্ব লাভ করতে পারতেন না। এই অবিরাম "ঝুলন"-দোলাই তাঁর কাব্য। সে দোলনের বৈচিত্র্য আর বিস্তার নিরবধি। গতি আর স্থিতি, বৈচিত্র্য আর ঐক্য, দুটিকেই কবি সমান মূল্য দিতে চান কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব নয় তাই কখনও বা বৈচিত্র্যের স্রষ্টা বৈচিত্র্য-পিপাসু মনকে নিন্দা করছেন:

"মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। ......প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই, এইজন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এত মনোহর।......সে একাকী অখণ্ড, সম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাহার অসীম-নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি দেদীপ্যমান।" এই প্রকৃতির মধ্যে (এবং নারীর মধ্যেও) "একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত আপনার পরিধি বিস্তার করে, সেইজন্য হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দর ভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে

পারে। এই যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণশক্তি (নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃ-পদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়" (পঞ্চভূত)। এই ঐক্যোপলব্ধি থেকে জন্মায় 'মুনিসম উলঙ্গ নির্মল কঠিন সন্তোষ।' এই সন্তোষই আনন্দ, এই আনন্দের জন্ম সৌন্দর্য-বোধ থেকে। সে সৌন্দর্যবোধ কি নিরাসক্ত প্রীতিজনিত? তার কি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই? আছে, কারণ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যে বাঁশীতে কবি সুন্দরকে আবাহন করেন

'......সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে—দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান।

আবার এই মঙ্গল ও সৌন্দর্যের তিনি সমীকরণ ঘটিয়েছেন সত্যের সঙ্গে, বারে বারে Keats এর সেই বিখ্যাত চরণটি উদ্ধার করেছেন : Beauty is truth, truth beauty.

সৌন্দর্যতত্ত্ব

এগার

তাহলে কবির কাছে এই তিনটি সমীকৃত: সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বলে উঠবেন—কেন, এ তত্ত্ব ত আমাদের আছেই: সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালায় 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর কথা বলেছেন। অতি আধুনিক কালেই 'শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্' ব্রহ্মের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে (বেদে, উপনিষদে বা পুরাণে) সত্যের সুন্দরের সঙ্গে বা এদের সঙ্গে শিবের সমীকরণ ঘটানো হয় নি (একমাত্র বৈষ্ণব রসসাহিত্যে সত্যের সঙ্গে সুন্দরের ছাড়া)। আলংকারিকদের মধ্যে নবম শতাব্দীর ভট্ট নায়কই প্রথম সাহিত্যিক রসোপলব্ধিকে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তিনিও আবার ঐ দুই উপলব্ধির পার্থক্যও নির্দেশ করেছেন। 'রসো বৈ সঃ' তত্ত্ব ব্রহ্মের আনন্দরূপের আস্বাদ্যমানতার কথা। রবীন্দ্রনাথ যে এই তিনটিকে একে সমাহিত ক'রে অন্যোন্যসাপেক্ষ করলেন এর পেছনে হয়ত আংশিক প্রভাব বৈষ্ণব দর্শনের, চৈতন্য-নির্ভর বৈষ্ণব-দর্শনই শুধু নয়, প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব প্রস্থানেরও, বিশেষ ক'রে ভাগবতের। ভাগবতের কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। তিনিই সত্যের নিলয়, সত্য-স্বরূপ; এবং তিনি রূপেরও সারভূত:

> বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
> বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
> রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
> বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণঃ প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥

[প্রেমধর্ম : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত]

[মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়া, দুইকানে কর্ণিকার ফুল, সোনার বরণ কাপড় আর গলায় বৈজয়ন্তীর হার প'রে, অধরসুধায় বেণু পরিপূরিত ক'রে, নটবরবপু কৃষ্ণ বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করলেন] তাঁকে দেখে

> সরসি সারসহংসবিহঙ্গাঃ
> হৃত্ত মিলিতদৃশো বদ্ধমৌনাঃ। [ঐ]

প্রেমহৃষ্টতনু লতাবৃক্ষেরা পর্যন্ত মধুধারা বর্ষণ করত। সেই রূপে. নিখিল বিশ্ব

পুলকে আত্মহারা

> ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
> যদ্ গোদ্বিজ দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। [ঐ]

চরাচরের এই পুলকহর্ষের মূল কারণ কৃষ্ণপ্রেম। এই প্রেম জাগ্রত না হ'লে কিন্তু এ রূপ অগোচরই থেকে যাবে। আর সেই প্রেমদৃষ্টিতে দেখলে কি মনে হবে?

> ধন্যেয়মদ্য ধরণী, তৃণবিরুধস্তৎ
> পদস্পৃশো, দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
> নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ
> গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ [ঐ]

যিনি ছিলেন উপনিষদে নির্গুণ, নিষ্কল ব্রহ্ম তিনি সগুণ হ'য়ে, কৃষ্ণরূপে, রূপ-মাধুরীতে জগৎকে বিমোহিত ক'রে জীবের কাছে শুধু প্রেমেই ধরা দিতে রাজী হলেন। অবশ্য বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মাস্বাদনকে প্রিয়ামিলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সে কেবল অলৌকিক অনুভূতিকে লৌকিক উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও ভক্তির কথা কিন্তু প্রেমকে ধর্মে উন্নীত করা ভাগবতেরই কীর্তি; পরে চৈতন্য, মীরা, কবীর প্রভৃতিতে এই প্রেমধর্মেরই আত্যন্তিক স্বীকৃতি। কিন্তু সে ত অলৌকিক স্তরে। লৌকিক স্তরে এদের সমীকরণ ভারতবর্ষে প্রতীচ্য-স্পর্শের আগে হয়নি এবং প্রতীচ্যেও এটি ঘটেছিল রোম্যান্টিক যুগে। ইংলণ্ডে শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি ও হাচিসনের দার্শনিক চিন্তায় এই তত্ত্বের প্রস্ফুটন আর ফ্রান্সে, রুশোর পরে এই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ Victor Cousin-র রচনায়। Cousin-র এই বিষয়ের বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর নামে। এই তিনটি শব্দকে একত্রে, সমীকৃত অর্থে, বোধ হয় এই প্রথম কোনো ভারতীয় ভাষায় দেখতে পাওয়া গেল। কীট্‌সের *Ode On A Grecian Urn*-এর সেই বিখ্যাত পংক্তির দার্শনিক পটভূমিকা হিসেবে এই গ্রন্থকে দেখা যেতে পারে। এই ভাবধারা যে কেউ কারও কাছ থেকে ধার করেন নি, এটি যে তাৎকালিক রোম্যান্টিক চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি অষ্টাদশ শতকের শেষে জার্মাণিতেও এই আলোচনা মুখর হয়ে উঠেছে। Schiller এর দীর্ঘ কবিতা Die Künstler-এ (১৭৮৯-এ প্রকাশিত) কেন্দ্রীয় বক্তব্যই হল সত্য আর সুন্দরের সম্পর্কের আলোচনা। তাঁর মতে, মর্ত-জীবনে মানুষ

সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে ভিন্ন উপলব্ধিই করতে পারে না—অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের প্রকাশ সৌন্দর্যে। মরজীবনের পরে, দেহহীন আত্মারূপে, আমরা অগ্নিবলয়িত-শিরসা সত্যের দেবী য়্যুরানিয়ার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করতে পারি কিন্তু মর্তে তিনি আমাদের কাছে আবির্ভূত হন মায়া-মেখলা-সমন্বিতা সৌন্দর্যের দেবী সাইপ্রিয়া রূপে। Schiller এর কবিতার যে দুটি পংক্তিতে এই ভাবটি ঘনীভূত হয়েছে সে দুটি হল :

Was wir als Schonheit hier empfinden
Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn

[যাকে এখন দেখছি সৌন্দর্য হিসেবে তাকেই পরে দেখব সত্যের রূপে]

ইংলণ্ডের Shaftesbery এঁদের আগে এবং তাঁর Deism এই সুন্দর ও সত্যের সমন্বয়ের এক অপূর্ব সেতু। সনাতনীরা সত্যের (বা ভগবানের) বহিঃপ্রকাশে যে বিশ্বাস করেন না তা নয় তবে সে অভাবিত ঘটনার মাধ্যমে, এবং যাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা তা করেন ঈশ্বর-কৃপায়। Deist কিন্তু মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজন-সাধনে এমন উপযোগিতা যে প্রকৃতির সেই প্রকৃতির মধ্যেই প্রকৃতি-নির্মাতা আপনাকে স্বতঃই প্রকাশ করছেন। গৃহয়ালু বা গ্রহণোন্মুখ মানুষ স্বাভাবিক চিন্তা বা অনুভূতির একাগ্রতা দিয়েই সেই প্রকাশের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। কেন না মানুষ, রোম্যান্টিকের এবং Deist এর মতে, স্বভাবতই ভালো এবং প্রকৃতিও সুন্দর এবং দয়াবতী। তাই মানবীয় সৌন্দর্যে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মিলন হয়; তাই মানুষে-প্রকৃতিতে এত একাত্মতা—ওয়ার্ডস্বার্থেও বটে, রবীন্দ্রনাথেও বটে। এই মনোভাবের শেষ স্তরে সত্য (ভগবান) আর আলাদা থাকে না—সত্য (ভগবান) আর সুন্দর প্রকৃতিতে এক হয়ে যায় এবং মানুষও হয় সেই প্রকৃতিরই অঙ্গ। এ হল প্যান্থীইজম্—এতে আর মানুষের বিশেষ স্থান বা মূল্য স্বীকৃত নয় :

যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।
হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখী গায়,

ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে'
মনে নাহি ক'রে বসি নিরালায়।

*　　*　　*　　*

ওদের এসেছে ডেকে আদি সমীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।

*　　*　　*　　*

সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন ॥

এই একাত্মতা, সত্যে-সুন্দরে অর্ধনারীশ্বরত্ব উপলব্ধির পথ যদি হয় একাগ্র চিন্তন বা অনুভূতি এবং রোম্যান্টিকের পক্ষে নিজের চিত্তপ্রসাদ যখন আসে আপন প্রবণতার অনুকূলে কল্পনার বিস্তারে, হৃদয়বৃত্তির অবাধ কর্ষণায়, তখন প্রেমই হল সুন্দরকে পাবার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তাই প্রেম আর প্রকৃতিতে এত নিবিড় যোগাযোগ রোম্যান্টিকের কাব্যে :

My soul is an enchanted boat,
Which like a sleeping swan, doth float
Upon the silver waves of thy sweet singing ;
And thine doth like an angel sit
Beside a helm conducting it,
Whilst all the winds with melody are ringing.
It seems to float ever, for ever
Upon that many winding river,
Between Mountains, woods, abysses
A paradise of wildernesses ;

(*Promethens Unbound,* Act II, sc. v ; Shelley)

সত্য, সুন্দর আর মঙ্গলকে উপলব্ধি করার জন্যে এই প্রেমই যে একমাত্র

অবলম্বন তা রবীন্দ্রনাথ যেন আর ব'লে ব'লে শেষ করতে পারছেন না :

"প্রভাতের পূর্বগগনে আলোকের প্রথম বিকাশ যেমন মধুর, মানুষের জীবনের প্রথম প্রত্যুষের অরুণরেখা যেদিন জেগে ওঠে সেদিন, শিশুর কণ্ঠে তার সংগীত তেমনি মধুর, তেমনি নির্মল।··· কিন্তু এই উৎসবের সংগীতের মধ্যে একটি করুণ সুর, একটি কান্না রয়েছে—···আনন্দের সুরের মধ্যে করুণার কোমল নিখাদ বাজছে। সে কিসের করুণা? পিতা ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সকলের সময় হয়ে ওঠে নি। জাগেনি সবাই।··· তারা কেউ বা উদাসীন, কারও বা কাজ আছে, কেউ বা উপহাস করছে, কাউকে বা অভ্যাসের আবরণ কঠিন ক'রে ঘিরে আছে।··· প্রেমিকের ডাক প্রেমাস্পদের কাছে আসছে, মাঝখানে কত ব্যবধান! কত অবিশ্বাস, কত কলুষ, কত মোহ, কত বাধা!··· সেই জন্যই তিনি যে **সৌন্দর্যের** সঙ্গীত বাজাচ্ছেন তার মধ্যে অমন কান্না রয়েছে। পৌঁছল না, সবাই এসে জুটল না, আনন্দ-সভা শূন্য পড়ে রইল। জগতের সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে এই কান্না বাজছে।··· সে বললে—'যে প্রেমলিপি আমি আনলুম সে লিপিখানি কেউ পড়ল না।" (শান্তিনিকেতন : সৌন্দর্যের সকরুণতা)"

ঈশ্বরের সত্যরূপ আর সৌন্দর্যরূপের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলছেন, "ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।··· এইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে।··· জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে, কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র অয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।··· কিন্তু, এমন করলে ত চলবে না—শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছায় স্বীকার না করে, তবে জন্ম জন্ম দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে।··· তিনিও পণ ক'রে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর ক'রে দেখাবেন না—বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না।" (শান্তিনিকেতন : সৌন্দর্য)

কিন্তু গোপন থাকছে কেন? ব্যবধান রচনা করছে কিসে? "এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম—সেখানে কি কেবল কাজ! কাজ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল এই কলহ, মাৎসর্য, বিরোধ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান! এই সুরেই কি সূর্য চন্দ্র সুর মেলাচ্ছে! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন যেদিন জননী শিশুকে প্রথম মুখচুম্বন করলেন! এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা, একে মানব না! পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না! সেইজন্যই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমনি একটি চিরবিরহের করুণা।" (সৌন্দর্যের সকরুণতা) তবু প্রকৃতির সৌন্দর্য কিছু আস্বাদন করা যায়; মানুষের জগতে সৌন্দর্যকে পাওয়া দুরূহ। কারণ প্রবিত্তির আত্মকেন্দ্রিকতা :

"সত্যকে সুন্দর আর সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল ক'রে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন রকম ক'রে দেখতে চাই—তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

"মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ।··· কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে, তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো ক'রে এবং স্বতন্ত্র ক'রে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়। কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখিতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।" (সুন্দর) Keats-ও সেইজন্যে মানবসংসারে সৌন্দর্য খুঁজে পান নি। সে সংসারের অবস্থাটি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও তীক্ষ্ণতর ভাষায় Keats তাঁর বিখ্যাত Nightingale ode-এ বর্ণনা করেছেন : (প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত যে এই ode-টি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল।)

The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.

অতএব Keats সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন নাইটিংগেলের কল্প-লোকে। ব্যক্তি-মানুষের রূপনির্মাণ বা সৌন্দর্য-সৃষ্টি বংশধারায় রক্ষিত ত হয় না। তার ওপর তার সৃষ্টি অন্যদের দ্বারা গ্রহণের অপেক্ষায় থাকে। অবহেলিত হলে তা মরেও যায় (Hungry generations tread it down)। কিন্তু নাইটিংগেলের গান বংশধারায় সংরক্ষিত এবং শ্রোতা-নিরপেক্ষ। যুগযুগ ধরে তার গীতের প্রকৃতির পরিবর্তন নেই। তাই সে স্থায়িত্বেরও নিদর্শন। সেই জন্যে সে সত্য—যেমন সত্য Grecian Urn-এ ক্ষোদিত মূর্তিগুলি। মানুষের কামনা-বাসনা-অতৃপ্তির তপ্ত হাওয়ার স্পর্শের ঊর্ধ্বে ওদের অবস্থান—ওদের আয়ু মানুষী আয়ুর তুলনায় অপরিমেয়। ওরা সত্য, মানুষের চিত্তবিক্ষেপ অসত্য। Keats এর কাছে সেইজন্যে Beauty is truth, truth beauty: পূর্বালোচিত romantic জীবনদর্শনের এই একটি বিশেষ লক্ষণ। সমাজ-নিপীড়িত romantic আত্ম-চৈতন্যের চূড়ান্ত মূল্যে আস্থাশীল এবং বাইরের যা কিছু এই চৈতন্যকে আনন্দিত করে তাকেই সে সত্যের স্বীকৃতি দেয়। আত্ম-চৈতন্য-সর্বস্ব romantic আপন উপলব্ধির মানদণ্ডেই সব কিছুর মূল্য নিরূপণ করে। শুধু তাই নয়, romantic, intellect বা বুদ্ধিকে গৌণ স্থান দেয় জীবনে। তার কাছে কল্পনা বা imagination-ই সত্যোপলব্ধির একমাত্র উপায়: "Poetry is the expression of imagination" এবং A poem is the very image of life expressed in its eternal truth (Shelley). তাই Keats শুধু প্রকৃতির মধ্যে সত্য আর সুন্দরের সমীকরণ করলেন [The fall of Hyperion-পুনর্লিখিত-টি বাদ দিলে]। রবীন্দ্রনাথ সেটুকু স্বীকার ত করলেনই, আবার এগিয়ে এসে মানুষের

জগতে এদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। সেখানে শতেক বাধা। বলতে বাধ্য হলেন :

"তুমি যা বলিবে কবি তাই সত্য হবে।
ঘটে যা তা সব সত্য নয়।"

দেব-মানবের মধ্যে আদর্শ চরিত্র কাউকে না পেয়ে নারদ বাল্মীকিকে বললেন যে তাঁর মনোভূমিই রামের জন্মস্থান। সে অযোধ্যার চেয়ে সত্য। অর্থাৎ আদর্শ যা, মঙ্গলময় যা তাই সত্য, তথাকথিত বাস্তব সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ আরও উদাহরণ দিয়েছেন :

"আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য নিরাপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়।" অথবা "ও দিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরব সভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক মাত্র হয়ে।" সে কালের কবি সমাজ-নীতির জয়গান করবার জন্যে যদি চরিত্রগুলিকে ঐ ভাবে রূপায়িত ক'রে থাকেন তাহলে "পুরাতন না হলেও, সাহিত্যে যে কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও, সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে তাকে মাপ করা চলবে না।" এই পরিমাপটি কি? সত্যনিষ্ঠা? সত্য কি? এ প্রশ্নের সাধারণ উত্তর নেই। সত্য, শিব, সুন্দরের যে ঐকতান রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে এবং কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছে তা ধর্মের ক্ষেত্রে, ভারতীয় ঐতিহ্যের নানা ধারার সংমিশ্রণ জাত হলেও, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করলে অলৌকিকের সঙ্গে লৌকিকের মিশ্রণ ঘটাতে হয়। বৈষ্ণবদের সাহিত্যের বিষয়বস্তুই অলৌকিক। তাই তাঁরা ঐ মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারেন তবু তাঁরাও রসোপভোগের ক্ষেত্রে মঙ্গলকে স্পষ্টত টেনে আনেন নি। ভারতীয় আলংকারিকেরাও সাহিত্যরসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদ ব্রহ্মচারী বলেছেন কিন্তু তার সঙ্গে সমীকৃত করেন নি। এটি প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক ভাবাদর্শজাত। কেন না রোম্যান্টিক, সব মানুষের, বিশেষ করে কবির স্বাভাবিক অলৌকিকত্বে (দেবত্বে) বিশ্বাসী এবং সেই কবির কল্পনা যা ধারণ করে তা সত্য আর সেই সত্য স্বতই সুন্দর এবং তার আস্বাদন কল্যাণকারী। এই ধারণা সত্য কি অসত্য, সে কথা এখানে বিবেচ্য নয়। কথা হল ধারণাটির উদ্ভব

নিয়ে। এই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের কথা শেলী অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত *A Defence of Poetry* প্রবন্ধে। স্রষ্টার সত্যদর্শন সুন্দর রূপ পরিগ্রহ ক'রে কি ক'রে মঙ্গলের নিদান হয় তার রোম্যান্টিক ব্যাখ্যা এই :

"To be a poet is to apprehend the *true* and the *beautiful*, in a word, *the good* which exists in the relation, subsisting, first between existence and perception, and secondly between perception and expression...... For he not only beholds intensely the present as it is, and discovers those laws according to which present things ought to be ordered, but he beholds the future in the present, and his thoughts are the germs of the flower and the fruit of latest time. Not that I assert poets to be prophets in the gross sense of the word, or that they can foretell the form as surely as they foreknow the spirit of events...... A poet participates in the eternal, the infinite, and the one ; (রবীন্দ্রনাথের সেই প্রেমিক যে ডাক দিয়ে বেড়ায় কিন্তু যার ডাক সংস্রের কানে পৌঁছায় না।) as far as relates to his conceptions, time and place and number are not .....Poetry acts in another and diviner manner (than ethical treatises). It awakens and enlarges the mind itself by rendering it the receptacle of a thousand unapprehended combinations of thought. Poetry lifts the the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were not familiar ; it reproduces all that it represents, and the impersonations clothed in the Elysian light stands thenceforward in the minds of those who have once contemplated them, as memorials of that gentle and exalted content which extends itself over all thoughts and actions with which it co-exists. *The great secret of morals is love* ; or a going out of our own nature

and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action, or person, not our own. A man, to be greatly good, must imagine intensely and comprehensively;...the pains and pleasures of his species must become his own. The great instrument of moral good is the imagination."[২০]

রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই বলছেন 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য প্রবন্ধে। কেন না কবি-কল্পনার মূল্য রোম্যান্টিক হিসেবে তাঁর কাছে আর শেলীর কাছে এক :

"জগতে যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব, ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত, সেই পরিমাণে আমিই ছোটো। সেইজন্যে আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্মশক্তি নিখিলকে কেবলি অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। (এ হল ভারতীয় নিবৃত্তিমার্গের বিপরীত কথা।) এমনি করিয়াই আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।...জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সৌন্দর্যবোধও তেমনি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে।... সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্ব-মাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর, তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরব-ঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির সৌন্দর্য দিয়া এমন সকল জিনিসকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ কারণ, অতি প্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না।... সৌন্দর্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে।... এ কথা নিশ্চয় জানি। সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় ও অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।... সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথে যে রোম্যান্টিসিজমের পূর্ণ বিকাশ তা আরও স্পষ্ট হবে বঙ্কিমের সঙ্গে তুলনায়। বঙ্কিম কোনোরকম সমীকরণ না ক'রে সাহিত্যকে সুশিক্ষার বাহন হিসেবে এবং ধর্মোপলব্ধির পথে প্রথম সোপান হিসেবে দেখেছেন। অন্যরকমে কেউ যদি সাহিত্য থেকে আনন্দ পাবার চেষ্টা করে তাহলে সে চেষ্টা অপচেষ্টা। সাহিত্যরসের কর্তব্য হল ধর্মরসে পৌঁছে দেওয়া। এ হল সেই নীতিবাদের 'আনন্দ বনাম শিক্ষা'—বিরোধে শিক্ষার জয়:

"সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য ও প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা একাংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্যে নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।" (বিবিধ প্রবন্ধ: ২য় খণ্ড: ধর্ম ও সাহিত্য।) আর রবীন্দ্রনাথের কাছে "সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিত্যের লক্ষ্য।...সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তি সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।" এ অবিকল সেই ম্যাথু আর্নল্ডের কথা যিনি তাঁর প্রখ্যাত প্রবন্ধ 'কাব্য-পাঠ'-এ বলেছিলেন যে ধর্মীয় সাহিত্যের সেইটুকুই মূল্যবান যেটুকু কাব্য-ভূয়িষ্ঠ।" এই aestheticism এর চূড়ান্ত পাই Ruskin, Pater এবং Oscar Wilde-এ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চেতনা সেই সমীকরণের অন্তরায় সম্পর্কে এত সচেতন যে তিনি, প্রতীচ্যের রোম্যান্টিকদের evil কে পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্বলতাকে সবলে পরিহার করেছেন। Wordsworth এর duty আর impulse এর দ্বন্দ্ব, Keats-এর formal beautyতে আশ্রয় পাবার চেষ্টা আর Shelley-র *Prometheus Unbound*-এ সহজ pantheism এ আস্থা—রবীন্দ্রনাথ এ সব পথে যান নি। তাঁর মঙ্গল ও সৌন্দর্য সহজে সমীকৃত হয় না। তিনি বলছেন:

"মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালো মন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে

পারে না।…আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়। .

"তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে।" Shelley তাঁর Demogorgon প্রকল্পে evil বা অশুভ বা অকল্যাণকে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করলেও জীবনে এই সামগ্রিক দ্বান্দ্বিক বা অনু-প্রতিলোম গতির সর্ব-ব্যাপিতা উপলব্ধি করেন নি—প্রায় কোনো প্রতীচ্য রোম্যান্টিকই করেন নি। গ্রীক দর্শনে যে dialectic গতির স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায় হেরাক্লাইটাস্-এ এবং সক্রেটিসে, তার পূর্ণ স্ফুরণ হল হেগেলে। তাঁর মতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি তখনই হয় যখন Spirit (বিশ্ব চৈতন্য) আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কোনো বস্তুকে আশ্রয় করেন—অর্থাৎ যখন আমরা কোনো বিশেষের মধ্যে অবিশেষকে উপলব্ধি করি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করি। ভাব থেকে রূপ আবার রূপ থেকে ভাব—এই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক গতি। কিন্তু বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে বিশেষের এই সম্পর্কের ব্যাপারটি যে কি ক'রে ঘটে, কেন ঘটে তা হেগেলে স্পষ্ট নয়। হেগেলও রোম্যান্টিক দার্শনিক ব'লে তাঁর চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার যোগ ত থাকবেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বিকাশের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, যে মঙ্গলের প্রবর্তনায় জগৎ-ব্যাপার সংঘটিত হয়ে চলেছে ব'লে মনে করেন, তা তাঁর সুস্পষ্ট উপলব্ধির বিষয় কেন না তিনি মূলত রূপকার—বিশেষকে নিয়েই তাঁর যত কাজ। এই মঙ্গলে একান্ত আস্থার ফলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের এত পার্থক্য। ক্রোচের কাছে সাহিত্য শুধু প্রকাশক্রিয়া। সেই প্রকাশের তাগিদের জীবনব্যাপারে যে কি মূল্য তা ক্রোচে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন না। সেইজন্যে ক্রোচে রূপ-সর্বস্ববাদী। রোম্যান্টিক চেতনার যে formal beautyকে আশ্রয় করার ঝোঁক তাকেই ক্রোচে চূড়ান্ত ক'রে দেখেছেন—তাঁর aesthetic তাই general science of linguistics এর অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ এই formalismকে গৌণ মূল্য দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে বড় এবং মুখ্য কথা হল ভাব বা idea এবং সেই ভাব, তিনি রোম্যান্টিক ও মর্তপ্রেমিক ব'লে, রূপের মধ্যে দিয়ে রূপাতীতকে ব্যঞ্জিত করে। সেই রূপাতীতকে উপলব্ধি করতে হলে "আপন হতে বাহির হয়ে

বাইরে দাঁড়া।" তাহলেই "বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।" তাহলে সার্থক সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য হল আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বিশ্বতোমুখ-তায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করা।

এ চেষ্টার দুটি দিক। একদিকে হল ভাবকে লৌকিক স্তর থেকে অলৌকিক রসের স্তরে উন্নয়ন। ব্যক্তিগত ভাবকে সাধারণের করা—যাকে বলে সামান্যীকরণ, ভরতের ভাষায় 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। এ হল সকল রসস্রষ্টার কর্তব্য। এ না হলে রসোদ্বোধই হবে না। এই হল সাহিত্যকর্ম বা রূপসৃষ্টি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইখানেই থামেন নি। সাধারণত কবি-সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে যে ব্যবধান প্রায় সকল সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যবধানটুকু রাখতে চান নি। কবি হিসেবে তিনি যা বলেছেন বা অনুভব করেছেন সমাজের মানুষ হিসেবে তিনি তা কাজেও করতে চেয়েছেন—যা সত্য ব'লে বুঝেছেন তাকে জীবনেও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা, ধর্ম, এমন কি কৃষি সম্পর্কেও তাঁর সত্যোপলব্ধিকে তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন; চরকা এবং বয়কট সম্পর্কেও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের কারণও এইখানেই নিহিত। ঘরে বাইরের নিখিলেশের মাধ্যমে যে সত্যকে তিনি জনমানসে সঞ্চার করতে চেয়েছেন তা তাঁর জীবনেও নানা কর্মকাণ্ডে প্রকট। স্বদেশী আন্দোলন থেকে স'রে গিয়ে তিনি যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন তারও কারণ তাঁর সত্যোপলব্ধি তাঁকে ব্যবহারিক জীবনে অনৃতাচরণ করতে দিল না। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পলাতক রোম্যান্টিকের পার্থক্য। এ কথা হয়ত সত্য যে, যে সত্যোপলব্ধিকে তিনি জীবনের কর্মে ও অনুভবে ধারণ করতে প্রয়াসী ছিলেন তা অন্তর্দ্বন্দ্বসঙ্কুল; হয়ত ব্যবহারিক জীবনে তার সম্পূর্ণ স্বীকরণ স্বতঃই অসম্ভব; তবু রবীন্দ্রনাথ কর্ম ও অনুভবের দ্বন্দ্ব ঘোচাতেই সারাজীবন নিরলস ছিলেন। তাঁর যেগুলি বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টা সেগুলির মধ্যে তাঁর বিষয়বুদ্ধির (অনেকের মতে তাঁর প্রচুর ছিল; না হলে শেষ পর্যন্ত জমিদারীটুকু রেখেছিলেন কি ক'রে, চেয়ে তাঁর আদর্শ-টাই বেশী প্রকাশ পায়। অন্তরে অনুভূত সত্যকে কর্মে রূপ দেবার সেই অক্লান্ত প্রয়াসে নিষ্ফলতার বেদনা আর জগতের প্রবঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী। তাই ব্যবহারিক জীবনকে একেবারে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন Rousseau, Chateaubriand, Baudelaire, Shelley, এমন কি

Wordsworth। যাঁরা তা না করেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে দুটি সত্তাকে লালন করেন শুধু নয়, দুটিকে দূরে দূরে রাখেন এবং ব্যবহারিক জীবনেও প্রচুর সার্থকতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ এর বদলে জীবনে দুঃখকে স্বীকার ক'রেই শুধু নেন নি, দুঃখের পরম মূল্যও স্বীকার করেছেন। এ কিন্তু সাধারণ রোম্যান্টিকের দুঃখবিলাস নয়, নয়

> Infections of unutterable sadness
> Infections of incalculable madness,
> Infections of incurable despair.

এ Schiller-এর Weltschmerz নয়। এ জিনিস আরও গভীর, যদিও এর মূল সনাতন ভারতীয় চেতনায় পাওয়া দুষ্কর।

দুঃখচেতনা

বারো

এ দুঃখেচেতনার স্থান সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর মেঘদূত প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে। তাঁহারা এ কথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন, সেইখানে সেইখানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।" "সুন্দর তুমি নয়ন ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল"—এ কথা একান্ত ভাবে মানুষের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে স্বীকৃতির ফল এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে মূল্য রেনেসাঁস-পরবর্তী হিউম্যানিষ্টিক প্রতীচ্যই দিয়েছে। আমরাও সেইখান থেকেই পেয়েছি। শেক্সপীয়র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা-কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্সপীয়রের লুক্রিস এবং ভিনস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিসের কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে, সে কথা সাহস করে বলি বা না বলি; কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিয়োপ্যাট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব, তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেক্সপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে।" আধুনিক মানুষের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথকে সুন্দরের সঙ্গে মঙ্গলকে যুক্ত করতে হয়েছে এবং সেই মঙ্গল দুঃখের মধ্য দিয়ে ভিন্ন লভ্যই নয়, কেন না একমাত্র দুঃখই ব্যক্তির জীবনের সঙ্কীর্ণ আত্মপরতা ঘুচিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে পারে উদার বিশ্বপ্রেম। তবে জীবনে উদ্ভিন্ন হয় সেই করুণার উৎস যার জন্যে 'রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা।" এ মঙ্গলময় সুন্দরকে দুর্বল লাভ করতে পারে না। অসংযত যে সে এই সৌন্দর্যের সৃষ্টিও করতে পারে না, আস্বাদনও করতে পারে না। এ কথা শেলীর, এ কথা কীটসের, এ কথা

ওয়ার্ডস্বার্থের কিন্তু তাঁদের উপলব্ধির গভীরতা রবীন্দ্রনাথের মত নয় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের চেতনায়ও এত তীক্ষ্ণ নয়। Wordsworth যখন বলেন, "A deep distress hath humanised my soul" তখন রবীন্দ্রনাথ দুঃখের মধ্যে দিয়ে সত্য ও মঙ্গলের চূড়ান্ত উপলব্ধির উজ্জ্বল রূপ দেখেন ভিখারী রাজপুত্রের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র গূঢ়ার্থ এইখানেই নিহিত। দুঃখের মধ্যে দিয়ে অনন্দে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। জগতের পেছনে যে মহাশক্তি, তার লীলাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখলেই দুঃখ, সমগ্রভাবে দেখলেই আনন্দ—সেই দেখা ভাবের দেখা, জ্ঞানের দেখা নয়।

"সংসারে সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে। যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে। সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

"কিন্তু মানব সংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিত্রকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী।…কী তাঁর দীপ্তি, কী তাঁর সৌন্দর্য, কী তাঁর পবিত্রতা! কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

"ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর! শুধু তাই নয়, তাঁর চারিদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ।……

"আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা

দেখব, জীবনকে সুন্দর বলে জানব, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' যিনি তাঁকে, ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব।" (সুন্দর)

দুঃখের মধ্যে দিয়ে অমৃতে উত্তরণের সাধনা। তাই কবির কাছে তিনি 'ঝড়ের রাতের রাজা'; তাই তার রথের চাকার তলায় 'হার ছেঁড়া মণি' গুঁড়িয়ে যায়। 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার। ও যে ভেঙেছে মোর দ্বার।' তাঁকে তিনি অন্ধকারের স্বামী ব'লে আহ্বান করেছেন :

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।...
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক থামি।...
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম,
ওগো মরুক না এই আমি।

মহাজীবনকে পাবার জন্যে তিনি মহামরণকে ডাকেন। তিনি আসেন শ্রাবণের ঘন মেঘের রাতে :

কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে আসে আসে।
দুখের পরে পরম দুখে   তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।
সে যে আসে আসে আসে॥

সকলে যখন ঘুমোয় তখন তিনি আসেন বিশ্রামের আরামকে সবলে ভেঙে দিয়ে। চোখের আলোয় তাঁকে দেখা যায় না কেন না ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ থাকা পর্যন্ত দুঃখ ত দুঃখই—সে ত অমৃত হ'য়ে ওঠে না। নিজের ক্ষুদ্র পাত্রখানা ভেঙে না ফেললে জগৎ এসে মনে বসবে কেমন ক'রে? তিনি প্রার্থনা করেন "এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে" কেন না বাইরেটা নীরব না হলে তাঁর "নীরব চরণধ্বনি" শোনা যাবে না। তিনি যে আলোর প্রয়াসী তা আসে অন্ধকারের পার হতে : "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। সেই ত তোমার আলো।" দুঃখের মধ্যে দিয়ে না গেলে আত্মশুদ্ধি হয় না, তাঁকে সত্যি চেনা যায় না। সুখ তাঁকে দূরে রাখে। সুখ আত্মার বিস্তারকে করে ব্যাহত, শক্তিকে জাগ্রত করে না :

পুষ্প দিয়ে মার' যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে-যে ধরে তোমার চরণকে।

এই তাত্ত্বিক উপলব্ধির মূল কথা বলেছেন পূরবীর 'দুঃখসম্পদ' কবিতায়, আর 'বেদনার লীলা'-তে বলছেন কি বেদনা থেকে সাহিত্যের সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় :

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতেই ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে,
সূর্যের কিরণ যেথা নৃত্য করে—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খলখল,
দোলে টলমল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে, আসে যায়, একান্ত হেলায়
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেই মতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

ভারতীয় ঐতিহ্যগত জীবনদর্শন দুঃখের অস্তিবাদী মূল্য স্বীকার করে না। দুঃখ বা অশুভ, সে দর্শনের মতে, আমাদের সত্যজ্ঞানের অভাবেই সঞ্জাত হয়। সেই দুঃখকে বৈরাগ্য দিয়ে, ঔদাসীন্য দিয়ে, সত্যজ্ঞান দিয়ে দূরীভূত করতে হবে। জীবনের উন্নয়নে দুঃখের কোনো মূল্য নেই। দুঃখ জীবনকে কিছুই দেয় না। তার হাত থেকে মুক্তি-পাবার জন্যেই আমাদের যত শাস্ত্রীয় উপদেশ। প্রতীচ্যের যে আস্তিক্যবাদী মানবতাবাদ মানুষের ব্যক্তিমূল্য স্বীকার করে, অথচ ঐহিক সুখকেই চূড়ান্ত ক'রে না দেখে, ইহাতিশায়ী সত্যের উপলব্ধিতে

জীবের চরম সার্থকতা খোঁজে, সেই মানবতাবাদই রবীন্দ্রনাথের কাছে অশুভের এবং দুঃখের এই মূল্য উদ্‌ঘটিত করেছে। এই অশুভ বা দুঃখ খ্রীষ্টান ধর্মের original sin-এর তত্ত্ব নয়। কেন না আধুনিক হিউম্যানিস্ট মানুষ আদিম পাপে বিশ্বাস করে না। সে বলে মানুষ মানুষ। সে দেবতাও নয়, পশুও নয়। মাটিতে জন্মে সে ধন্য কিন্তু সে মুখ তুলে আছে স্বর্গের দিকে। আদিম বা সহজাত পাপের বদলে ভারতীয় মন কর্মফলে এবং কর্মের বিপাকেই আস্থাবান। তাই দুঃখ তার কাছে কিছুতেই চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেতে পারে না এবং পায় না। কষ্ট না পাওয়াই চিৎ-স্বরূপ মানবাত্মার স্বভাব কিন্তু কর্মের বিপাকে তার যে কষ্ট সে কষ্ট তার সত্য-স্বরূপকে স্পর্শ করে না। সেই দুঃখকে সত্যের মূল্য দিয়ে বিয়োগান্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা প্রাচীন ভারতীয় মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালে যে ট্র্যাজিডি লেখা হয়েছে সে এক হিসেবে যেমন প্রতীচ্যের অনুকরণের ফল, অন্যদিকে তেমনি প্রতীচ্য-স্পর্শে নূতন ভাবে জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত হবারও ফল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতীচ্যে দুঃখের আত্যন্তিক মূল্য সেই খ্রীষ্টপূর্ব যুগের গ্রীসেও স্বীকৃত। সেই দিক থেকে বিচার করলে সফোক্লেস বা ইউরিপি-দিসের সঙ্গে কালিদাসের একান্ত পার্থক্য। যে মুহূর্তে মানুষ ট্র্যাজিডিতে আপন জীবনের সার্থকতম রূপায়ণ লাভ করল সেই মুহূর্তেই সে, সচেতনে না হলেও অচেতনে, সনাতন ধর্মানুসারী জীবনদর্শন ছেড়ে অহংমুখী জীবন-দর্শনকে আশ্রয় করে। ট্র্যাজিডি মানবাত্মার বীর্যই ঘোষণা করে। দুঃখের কাছে নতি স্বীকার যে মানুষ না করে ট্রাজিডি তারি জয়গান। মানুষের, অন্ততঃপক্ষে প্রতীচ্যের মানুষের, যে চিরন্তন প্রশ্ন ট্র্যাজিডিতে জিজ্ঞাসিত তা হল :

Antigone— And what law of heaven have I transgressed? Why, hapless one, should I look to the gods any more,—what ally should I invoke,—when by piety I have earned the name of impious? Nay, then, if these things are pleasant to the gods, when I have suffered my doom, I shall come to know my sin; but if the sin is with

my judges, I could wish them no fuller measure of evil than they, on their part, mete wrongfully to me.

[*Antigone* : Sophocles]

অথবা

Lear— And my poor fool is hang'd ! No, no, no life
Why should a dog, a horse, a rat, have life,
And thou no breath at all ?

[*King Lear* : Shakespeare]

অথবা

Bride— Be still ! Be still ! Take your revenge on me ; here I am ! See how soft my throat is ; it would be less work for you than cutting a dahlia in your garden.........

Mother— But what does your good name matter to me ? What does your death matter to me ? What does anything about anything matter to me ? Blesse'd be the wheat stalks, because my sons are under them : blessed be the rain, because it wets the face of the dead. Blessed be God, who stretches us out together to rest.

[*Blood Wedding* : F. G. Lorca : translated from the Spanish by James Graham-Lujan and Richard L. O'Connell]

অথবা

Chorus— And what is the meaning of happening ?
What ambush lies beyond the heather ?
And behind the standing stones ?
Beyond the Heaviside Layer
And behind the smiling moon ?

And what is being done to us?
And what are we, and what are we doing?
To each and all of these questions
There is no conceivable answer.
We have suffered for more than a personal loss—
We have lost our way in the dark.

[*The Family Reunion* : T. S. Eliot]

এই চারটি উদ্ধৃতির মধ্যেই ধরা রয়েছে বিগত আড়াই হাজার বছর ব্যেপে প্রতীচ্যমানসে দুঃখচেতনার ইতিহাস। প্রাচ্য-মানসে, প্রতীচ্যের স্পর্শ লাগার আগে, এ চেতনার স্ফুরণ নেই। প্রাচীন চীনের তাও-বাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের মধ্যযুগীয় প্রেম-তত্ত্ব পর্যন্ত কোথাও প্রাচ্যের মানুষ এই প্রশ্নে এমন আমূল আলোড়িত হয় নি। হীনযান বৌদ্ধ দর্শনের কথা আলাদা। তার কোনো স্থান ভারতীয় মানসে আছে কিনা বলা দুষ্কর।

প্রতীচ্যে এই চেতনা খ্রীষ্টধর্মের original sin-এর তত্ত্বে পরবর্তী কালে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শুধু সমস্যাকে এক ধাপ পেছিয়ে দেওয়া মাত্র। পেছিয়ে দিয়েও সাধারণ মানুষের মনে এ প্রশ্ন চাপা দেওয়া যায় নি—কেন মানুষ এত দুঃখ পায়? প্রতীচ্য জীবনদর্শনে প্রভাবিত, আমাদের দেশের প্রথম দার্শনিক, বিবেকানন্দ তাঁর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সার কথা জগৎবাসীর সামনে উপস্থাপিত ক'রে শেষ করেছেন এই স্বীকারোক্তি ক'রে যে, দুঃখের কোনো কিনারা হিন্দুদর্শনের কোনো প্রস্থানেই কিছু করা হয় নি—দুঃখের অবধি বা উৎস নির্ণয়ে সবগুলিই সমভাবে অসমর্থ। খ্রীষ্টধর্মও অসমর্থ। তার original sin এর তত্ত্বের পেছনে আসলে যে কি মনোভাব আছে তা C. G. Jung তাঁর বিখ্যাত *Transformation Symbolism in Mass* প্রবন্ধে অতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। যীশুর ক্রসে বিদ্ধ হয়ে জীবনান্ত ঘটল। কেন?

"What is the reason for this 'punishment' of God? Despite the almost blasphemous nature of this question—my arguments here are not for children—we must nevertheless ask it in view of the obviously punitive character of the sacrifice. The

usual explanation is that Christ was punished for our sins. The dogmatic validity of the answer is not in question here. As I am in no way concerned with the Church's explanation, but only wish to reconstruct the underlying psychic process, we must logically assume the existence of a guilt proportionate to the punishment. If mankind is the guilty party, logic surely demands that mankind should be punished. But if God takes the punishment on himself, he exculpates mankind, and we must then conjecture that it is not mankind who is guilty, but God (which would logically explain why he took the guilt on himself). For reasons that can readily be understood, a satisfactory answer is not to be expected from orthodox Christianity. But such an answer may be found in the Old Testament, in Gnosticism, and in late Catholic speculation. From the Old Testament we know that though Yahweh was a guardian of the law he was not just, and that he suffered from fits of rage which he had every occasion to regret. And from certain Gnostic systems it is clear that the *auctor rerum* (creator) was a lower archon who falsely imagined that he had created a perfect world, whereas in fact it was woefully imperfect. On account of his Saturnine disposition this demiurgic archon has affinities with the Jewish Yahweh, who was likewise a world creator. His work was imperfect and did not prosper, but the blame cannot be placed on the creature any more than one can curse the pots for being badly turned out by the potter !... In these explanations we find the natural logic we missed in the answer of the Church. God's guilt consisted in the fact that, as creator of the world and king of his creatures, he was inadequate and therefore had to submit to the

ritual slaying."[২১] এই চেতনা এবং এই ক্ষোভ মানুষের অন্তরে ধূমায়িত হয়েছে এবং মধ্যযুগের পরে মানবতাবাদ যখন মানুষকে নূতন মর্যাদা দিল তখন জন্মাল শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডি, ক্যালডেরণের, লোপ দ্য ভেগার। রেনেসাঁসের পর থেকে humanism-এর প্রসার অব্যাহতই আছে—কেবল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাতে লাগছে গভীরতর বিষাদের ছোঁয়া; কেন না, বিজ্ঞান, কি জড় কি চৈতন্য, দুই বিশ্বেই determinisim (যাকে বৈজ্ঞানিক প্রাক্তনবাদ বলা যেতে পারে) এর ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। এতে প্রতীচ্যে, দুঃখ-চেতনা তীক্ষ্ণায়িত হচ্ছে। Goethe, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারুইন, কেয়ার্ড, টেনিসন, ম্যাথ্যু আর্ণল্ড, জর্জ সাঁ, সদ্য সদ্য রবীন্দ্র-মানসে সঞ্চারিত হচ্ছেন; তার পেছনে আছেন রোম্যান্টিকেরা; ভিত্তিতে আছে যে ব্রাহ্মধর্ম তারও অনুপ্রেরণার উৎস যে প্রতীচ্যের empirical rationalism—অর্থাৎ হিউম ও কাণ্ট—তা আজ স্বীকৃত। Original sin-এর তত্ত্ব না মানায় Protestant দের দুঃখচেতনা যেমন তীব্র এবং অহং-মুখী ব্রাহ্ম আন্দোলনে (England-এ Reformation এর মত, অথবা সমগ্র Protestant আন্দোলনেরই মত) তেমনি, ব্যক্তির চিত্ত মুখ্য ব'লে স্বীকৃত হওয়ায়, অশুভ বা অকল্যাণের বা দুঃখের চেতনার ঐকান্তিক মূল্যে আস্থা স্থাপন না ক'রে উপায় নেই এবং জড় ও চেতনে যে দ্বন্দ্বকে হিন্দুদের সনাতন দর্শন নানাভাবে চৈতন্যেরই নানা পর্যায়ের লীলা ব'লে ব্যাখ্যা করেছে, ব্রাহ্ম দর্শন তা পারে নি। জড়ের সঙ্গে সংঘাতেই দুঃখের বৃহত্তর অংশের উৎপত্তি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯/২০ বছর বয়সের সময় সেই জড়কে কি ভাবে দেখতেন, বিশেষ ক'রে La Mettrie, Holbach, Gassendi, Locke, Boyle ইত্যাদিকে পড়ার কালে ?—

"আমি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব! তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম, প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব! তবে তো গিয়াছি! এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি, স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে; যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই

যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ।"

[আত্মজীবনী : তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

'সেঁজুতির' প্রথম কবিতাতে রবীন্দ্রনাথেরও সেই একই দ্বন্দ্ব

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে-তৃষ্ণা যে-ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল ক'মে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছে আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দির বেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস পাচ্ছেন চৈতন্যের অবিসংবাদিত প্রাধান্যে। দেবেন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন, চূড়ান্ত বিশ্বাসে তাকে গ্রহণও করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথে যে মনোভাব তীক্ষ্ণ, ঋজু, রূপের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত—রবীন্দ্রনাথে তা রূপ আর অরূপ, বস্তু আর চৈতন্যের দ্বন্দ্বে কম্পিত, বিক্ষুব্ধ, শিহরিত। ঐ কবিতাতেই তিনি আবার প্রকৃতির কাছে তাই ঋণ স্বীকার করছেন :

তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—

জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান।

এবং রবীন্দ্রনাথ মূলত ঋষি বা সাধক না হয়ে রূপকার ব'লে এই দ্বন্দ্বই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক; আর দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হল নিঃশেষে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে, চৈতন্যের ঈশিত্ব স্বীকার করা; তাঁর ত আর রূপসৃষ্টির দায় নেই। ফলে দেবেন্দ্রনাথ যে দুঃখ উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই দুঃখের বিচিত্র নিষ্পেষণে রূপলোক সৃষ্টি ক'রে চললেন : "নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।" দুঃখকে উত্তীর্ণ হতে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন চান নি, কেন না উত্তরণের যে সনাতন পথ তা হল 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'। মাঝে মাঝে বিরক্তিতে, হতাশায় তিনি ইহকে বর্জনের কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শনের দৃঢ়তর ভিত্তি হল ইহমুখিতা। দুঃখের অস্তিবাদী মূল্যে তিনি তাই আস্থা স্থাপন না করে পারেন না : "বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।" সনাতন হিন্দু, প্রকৃতির (বহির্বিশ্ব এবং ষড় রিপু) রাজ্য উত্তীর্ণ হয়ে, চৈতন্যে আসন-লাভ করতে চায়। সে জানে যে এই শক্তি বা প্রকৃতির রাজ্য অপরিহার্য হলেও দুঃখের আকর, তাই একে উত্তীর্ণ হতে হবে। এই দুঃখকে হিন্দু লালন করে না, বলে না,

পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া।
এই নাড়াতেই লাগছে খুশি, লাগছে ব্যথা কভু।

[সেঁজুতি : পালের নৌকা]

সে কি কখনও বলবে ?—

যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে অনেক আধুনিক বিদগ্ধ জন রবীন্দ্রনাথে evil এর স্বীকৃতি পান না; তাঁর নাকি evil এর চেতনাই নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনে দুঃখ এবং তার উপাদান-কারণ অশুভের অতি দীর্ঘ ছায়াপাত এত গভীর যে সে বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁর সৃষ্টির প্রকাণ্ড অংশ একেবারে

অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। সব শেষে আর একটি উদাহরণ দেব। কারও কারও ধারণা রবীন্দ্রনাথ *Othello* সহ্য করতে পারতেন না। এর অর্থ যদি এই হয় যে রবীন্দ্রনাথ তার রসাস্বাদনই করতে পারতেন না তাহলে এই স্বয়ং-প্রধান সমালোচকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয় : কি করে রবীন্দ্রনাথ "মালঞ্চ" লিখলেন? মালঞ্চে ঈর্ষার যে তীক্ষ্ণ রূপ তা কি এক হিসেবে Othello-র চেয়েও অসহ্য নয়। 'দুই বোনে' যে ঈর্ষাকে তিনি রুখে দিয়েছেন মালঞ্চে আর তাকে এতটুকু সংযত করেন নি। *Othello*-তে শেষে Othello-র আত্মহত্যায় যে দাহের পরিসমাপ্তি এবং দ্রষ্টার সহানুভূতির চূড়ান্ত উৎসারণ তার এতটুকু চিহ্ন 'মালঞ্চের' শেষে নেই। শেষ দৃশ্যে নীরজার ঈর্ষার যে বীভৎস আক্ষেপ, অবচেতনের যে প্রেতের অসহ্য আক্রোশ আর আর্তনাদ, তার ত কোনো স্নিগ্ধায়ন রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়নি। আদিত্য আর সরলা যেমন দুঃসহ ভয়ে হতবাক, আমরাও তেমনি। এই প্রেতচ্ছায়া এদের দুজনের জীবন থেকে অনপনেয় হয়েই থাকবে। আদিত্য আর সরলা, জীবনের এই যে অপরিমেয় অশুভের ঘটক ও দর্শক, তাদের কি সান্ত্বনা রইল? সান্ত্বনা কিছু না, শুধু আত্মজ্ঞান; শুধু আত্মসাক্ষাৎকার। জীবনের আলোড়নে যে বিষ উঠল তাতে নীরজা পুড়ল আর এরা নীলকণ্ঠ হল না, শুধু বুঝল দুঃখ জীবনে কি বিপুল। তার সামনে সব চাপল্য স্তব্ধ হয়ে যায়। মানবাত্মা পরিশুদ্ধ হয়, স্নান ক'রে শুচি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রকৃতি

১৩

প্রকৃতির কথা অগেই অনেক প্রসঙ্গে উঠেছে। প্রকৃতি বলতে বুঝি বহিঃ-প্রকৃতি আর আন্তর প্রকৃতি বা মনুষ্য প্রকৃতি। সাহিত্য বা কাব্যে প্রকৃতি বলতে সাধারণত বহিঃ প্রকৃতিকেই বোঝানো হয় এবং সেই বহিঃ প্রকৃতিকে কবি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তার বিচার করা হয়। তবে একটু পরেই আন্তর প্রকৃতিকেও আর বাদ দেওয়া যায় না। কবিব দৃষ্টিভঙ্গীর পবিবর্তন, বিবর্তন, এবং যাকে ইংরেজিতে বলে maturation বা পরিপাচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকে দেখারও পার্থক্য ঘটে। এমন কি একই কবিতার এক অংশে এক দৃষ্টিকোণ এবং অন্য অংশে পৃথক এক দৃষ্টিকোণের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কালিদাসের মেঘদূতে পূর্বমেঘের প্রকৃতি আর উত্তরমেঘের প্রকৃতি এক নয়—পূর্বমেঘে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাধারণ প্রকৃতি আর উত্তর মেঘে ইন্দ্রিয়াতীত প্রতীকী প্রকৃতি—naturalistic আর symbolic। ওয়ার্ডস্বার্থের বিখ্যাত 'লুসি' কবিতাগুচ্ছে প্রথম থেকে চতুর্থ বিভাগ পর্যন্ত যে প্রকৃতিকে পাই পঞ্চম বিভাগে আর তাকে পাই না। পঞ্চমে প্রকৃতি পর্যবসিত হয়েছে এক জড়, যান্ত্রিক পদার্থে—যার কাছে মানুষের অন্তরের কোনো মূল্যই নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-দর্শনের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য। তিনি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেছেন; কখনও আগের দেখা পরের দেখায় বিবর্তিত হয়েছে; কখনও আগের দেখা সম্পূর্ণ অভিভূত হয়েছে পরের দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে; কখনও আবার একেবারে অভিনব একটি দৃষ্টিকোণ বিকাশ লাভ করেছে; কখনও আবার মনে হচ্ছে তিনি অতীতের উপলব্ধিতে ফিরে গিয়েছেন। এই পরিবর্তনের স্তর-স্তরান্তরে, মানবাত্মাকে দেখার ভঙ্গীও কখনও বিরোধ কখনও অন্বয়মুখে, সংযুক্ত হয়েছে। মানুষ আর বহির্বিশ্ব নানা সম্পর্কের আভাসে কবি-মানসকে আলোড়িত করেছে।

এ কথা অনেকের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হবে যে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, এমন কি একাত্মতা ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা আর একাত্মতা এক নয়। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি-চেতনা অতি গভীর কিন্তু কালিদাস কখনই

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বা তাদাত্ম্য বোধ করেন নি। কালিদাস কখনও প্রকৃতিকে দেখেছেন মানবমনের পটভূমিকা হিসেবে, কখনও বা মানবমনের আবেগ প্রকৃতিতে আরোপ করে। এই শেষোক্ত ব্যবহারকে ইংরেজিতে বলে pathetic fallacy, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এর নাম বৈচিত্র্যানুসারে একাধিক। অবশ্য অলংকারের কথা এখানে অবান্তর কেন না অলংকারের জন্ম কবিচিত্তে এবং কবিচিত্তের সংস্থানই আমাদের আলোচ্য। কালিদাস কুমারসম্ভবের আরম্ভে আবার এত কৃত্রিম যে ওখানে অলংকরণ ভিন্ন আর তাঁর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। কিন্তু মেঘদূতে, কুমারসম্ভবে, শকুন্তলায়—কোথাও কালিদাস বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-চেতনার কোনোপ্রকারের সমীকরণ করেন নি। তাঁর কাছে প্রকৃতি মূলত জড়। তার সঙ্গে চেতনের আত্যন্তিক পার্থক্য :

"আমরা এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে হিন্দু কবিগণ জড়জগৎকে দূর হইতে দেখিতেন; তাঁহারা দেখিতেন জড় জগৎ নিম্নে, অন্তর্জগৎ উপরে। সংস্কৃত কবিরা জড় জগতের সহিত মিশিয়া জড় জগতের বর্ণনা করিতে ভালোবাসিতেন না, তাঁহারা উপর হইতে জড়-জগৎ দেখিতেন। কালিদাস বল, ভবভূতি বল, এই চক্ষেই জড়-জগৎ দেখিয়াছেন।...হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড়-জগৎ প্রাণিজগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে। তাঁহারা এ কথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন সেইখানে, সেইখানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই সংস্কারের বশেই তাঁহারা, মানুষ জড়-জগতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জড়-জগতের শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহস করেন না। তাঁহারা দেখান, মানুষ উপরে, জড়-জগৎ নীচে; মানুষ জড়-জগৎ হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্টা সাক্ষীমাত্র। এরূপ বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশে, শকুন্তলায় প্রথমে, ভবভূতির মহাবীরচরিতে শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। ভারবি অর্জুনকে জড়-জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে ঊর্ধ্বে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই।...মেঘদূতের স্বভাববর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, নগরী কিরূপ

দেখিবেন তাহাই লইয়া কবি ব্যস্ত হইয়াছেন।" [মেঘদূত : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে রাম যখন সুগ্রীবের সাহায্য পাবার আশায় কিষ্কিন্ধ্যায় অপেক্ষা করছেন তখন একে একে সব ঋতু তাঁর চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে আর তিনি সুগ্রীবের অবহেলায় অধৈর্য হওয়া সত্ত্বেও সেই ঋতু-পরম্পরার বিকাশ দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনার কাছে কালিদাস যে মেঘদূতে ঋণী এ কথা এইটুকুই প্রমাণ করে যে দুজনেরই প্রকৃতি-দর্শনের রীতি এক। বাল্মীকি এই বর্ণনায় কোনো Pathetic fallacy-রও প্রয়োগ করেন নি। প্রকৃতির রূপকে তিনি শুধু দূর থেকে নিরীক্ষণ করেছেন। তা না হলে ঐ মানসিক অবস্থায় রাম কি ক'রে বর্ষার ঐ সৌন্দর্য উপভোগ করছেন?

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥

দূর থেকে এই শোভা দেখছেন বলে, কি বাল্মীকিতে, কি কালিদাসে প্রধান অলংকার হল উপমা, বহু ক্ষেত্রে পূর্ণোপমা। বাল্মীকিতে ক্বচিৎ কখনও সমাসোক্তি পাওয়া যায়। যেমন :

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্॥

[কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড]

ইউরোপের প্রাচীনতম মহাকবি হোমারেও এই উপমার একচ্ছত্র আধিপত্য। পুরাণ এবং পরবর্তী classical যুগেও প্রকৃতির প্রতি এই মনোভাবই পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যে প্রকট। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের ব্যাপারকেও স্বতন্ত্র ব'লে মনে করবার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট এবং কালিদাসের শকুন্তলায় প্রকৃতির স্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে টেম্পেস্টে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা নেই তবু তাঁর লক্ষ্য এড়ায় নি যে শকুন্তলাতেও প্রকৃতি "আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।" এই অসম্পৃক্ত দৃষ্টি, রবীন্দ্রপূর্ব বিহারীলাল পর্যন্ত চ'লে এসেছে। মধুসূদনে যেটুকু প্রকৃতি আছে সে ত নিছক অলংকরণের জন্যে। পুরাণ বা মহাকাব্য বা classical সংস্কৃতের যুগের আগে, মানুষের

কৃষ্টির ইতিহাসে প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির অন্যতম যে বেদ সেখানে প্রকৃতির প্রতি মনোভাবে animism বা সর্বপ্রাণবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের মানুষের মানসিকতা আর রূপকথার যুগের আদিম মানুষের মানসিকতায় পার্থক্য হয়ত খুব বেশী নয়। যে রূপকথার যুগে মানুষ সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মধ্যে মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর প্রতিরূপ দেখত সেই যুগ থেকে কালিদাসের যুগ কত দূরে। প্রকৃতির ওপরে যেটুকু প্রভুত্ব মানুষ অর্জন করেছে তারি ফলে চৈতন্যকে জড়ের একেবারে ওপরে বসিয়ে, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে দেখতে লাগল—কখনও আদরে, কখনও প্রশ্রয়ে, কখনও আপন আবেগের পরিপূরক হিসেবে। নাগর সভ্যতার বৈদগ্ধ্য নিয়ে কালিদাস, ভবভূতি বা ওদিকে ভর্জিল—প্রকৃতিকে, চৈতন্যের বিপরীত, ভগবৎ-সৃষ্ট, মানুষের জগতে একান্ত প্রয়োজনীয় এক বস্তু হিসেবে যে দেখবেন এইটেই স্বাভাবিক। চিন্তা বা কৃষ্টির জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে এই মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বিহারীলাল পর্যন্ত এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর 'নিসর্গ-সন্দর্শন' এ কথার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথও সমুদ্র দর্শন করেছেন। বিহারীলালে রবীন্দ্রনাথে তফাৎ কোথায়। এখানে শিল্পনৈপুণ্যের বা বাক্-কুশলতার প্রশ্ন তুলছি না। প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর। বিহারীলালের কবিতায় সমুদ্র সমুদ্রই, আর কিছু নয়; কখনও সে মনে করিয়ে দিচ্ছে ইংলণ্ডের কথা, রামচন্দ্রের কথা আবার অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণের কথা, কখনও পরাধীনতার কথাও। সব কথাগুলি মিলে একটি কথা হয়ে উঠেছে কি না, ভাবের ঐক্য আছে কি না, কথাগুলি ভাবের স্রোতে এসেছে না কষ্ট ক'রে আনা হয়েছে—এ সব এখন বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হচ্ছে এই কথা যে সমুদ্র বিহারীলালের চৈতন্যের বাইরে একটি জড় বস্তু—সে যত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডই হোক। রবীন্দ্রনাথে সেই সমুদ্র অপূর্ব অতিশয়োক্তিতে 'আদি জননী সিন্ধু'; স্নেহে উন্মাদিনী সে সন্তান বসুন্ধরাকে আঁকড়ে ধরছে; বসুন্ধরার সন্তান কবি সমুদ্রের নির্বিরাম ভাষণের যেন কিছু বোঝে:

> …মনে হয়, যেন মনে পড়ে
> যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
> অজাত-ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
> ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
> মুদ্রিত হইয়া গেছে।

কবি একেবারে তাদাত্ম্য লাভ ক'রে সৃষ্টির আদিম রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করছে যেন :

দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড আকুল
আত্মহারা, প্রথম গর্ভের মহা-রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া।

এখানে সমুদ্র ব'লে আলাদা কিছু আর নেই! আছে শুধু জননী আর তার ভ্রূণ—সেই ভ্রূণের মধ্যে কবি-সত্তারও আদিমতম স্ফুরণ। এ এক অখণ্ড চেতনা যার মধ্যে জড় এবং চেতন এক হয়ে গিয়ে ঐক্যোপলব্ধি ঘটিয়েছে।

এই হল প্রতীচ্যাগত রোম্যান্টিসিজমের বিশিষ্ট প্রকৃতি-চেতনা। মেঘদূত আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যে বিশ্লেষণ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে সেই বিশ্লেষণেই প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক কবিদের অনুরূপ প্রকৃতি-চেতনার কথা শাস্ত্রী মশায় উল্লেখ করেছেন, হিন্দুর সনাতন প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে প্রতীচ্যের চেতনার পার্থক্য নির্দেশ করে :

"ইংরাজী সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম।… Childe Harold যে চক্ষে জড়জগৎ দেখিয়াছেন, সে চক্ষে আমাদের কবিরা জড়-জগৎ দেখেন না।" অন্য একটি প্রবন্ধে [বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি] বায়রন সম্পর্কে বিস্তৃততর মন্তব্য : "চল,…তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে, ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে। এই আনন্দই আনন্দ আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার; সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট, কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।"

বায়রনের কাব্যে রোম্যান্টিক চেতনার আংশিক বিকাশ মাত্র—তিনি জীবনের গভীর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত; তিনি চলেন শুধু ওপরে ওপরে; প্রকৃতিতে তাঁর আনন্দের বৃহত্তর অংশই হল escapism বা পলাতক মনোবৃত্তি-সঞ্জাত এবং তাঁর wanderlust হল স্থূল। তবু সেই যুগে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছিল Goethe-র পরেই এবং স্বয়ং Goethe তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গেও, রবীন্দ্রপূর্বযুগে, বায়রনের হৃদ্যতা যত বেশী ছিল তত

ছিল না শেলী, কীটস বা ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে। তাই বায়রনে রোম্যাণ্টিক চেতনার মুখ্য বিকাশ না হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রীমশায়ের মত মনীষীদের চোখ এড়ায় নি যে তাঁর মধ্যেও কল্পনার সেইগুণ রয়েছে, জীবনদর্শনের সেই প্রবণতা রয়েছে যা প্রকৃতি আর মানুষকে স্বতন্ত্র মনে ক'রে সুখ পাচ্ছে না :

> I live not in myself, but I become
> Portion of that around me ; and to me
> High mountains are a feeling, but the hum
> of human cities torture.

এই মনোভাব আর একটু তীব্র হলেই আমরা পাই সেই ওয়ার্ডস্বার্থকে যিনি প্রকৃতির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলেই অনুভব করতেন "I see into the life of things" এবং প্রকৃতির মধ্যেই যিনি ব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত সত্যকে বৈদ্যুত উজ্জ্বলতায় উপলব্ধি করেছিলেন :-

> ......The immeasurable height
> of woods decaying, never to be decayed,
> The stationary blast of waterfalls,
> And in the narrow rent at every turn
> Winds thwarting winds, bewildered and forlorn,
> The torrents shooting from the clear, blue sky,
> The rocks that muttered close upon our ears
> Black drizzling crags that spake by the wayside
> As if a voice were in them, the sick sight
> And giddy prospect of the raving stream,
> The unfettered clouds and region of the Heavens
> Tumult and peace, the darkness and the light—
> Were all like the workings of one mind, the features
> Of the same face, blossoms upon one tree ;
> Characters of the great Apocalypse,
> The types and symbols of Eternity,
> Of first, and last, and midst, and without end.

[*Prelude* , BkVI]

মানুষের কল্পনাকে যে মূল্য দিলে, অর্থাৎ মনুষ্য-প্রকৃতিকে যে দৃষ্টিতে দেখলে এই উপলব্ধি সম্ভব হয় সে মূল্যের কথা শেলী তাঁর "A Defence of Poetry"-তে এবং ওয়ার্ডস্বার্থও Prelude-এ বহুবার বলেছেন। যে দৃষ্টিতে কল্পনা শুধু মিথ্যার জাল বোনে, সে যত মনোহরই হোক না কেন, সে দৃষ্টি এই উপলব্ধিকে এমন সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারে না। রোম্যান্টিকের মতে কল্পনাই শুধু সত্যের (এবং সুন্দরের) কাছে পৌঁছে দিতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাই। তিনি বহুবার, বহু সূত্রে এ কথা স্মরণই শুধু করিয়ে দেন নি, বলেছেন—এই হল তাঁর জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। পদ্যে বলেছেন, গদ্যে বলেছেন, নাটকে বলেছেন। তাঁর বহু-প্রচারিত মত হল, পণ্ডিতে বোঝে না, দরদী বোঝে। তাই তাঁর কবিতার ভাবী পাঠক বিদগ্ধ জন নয়, সরলা বৈদগ্ধ্য-বিহীনা, সহৃদয়া। তাঁর কবিতা, তাঁর মতে, কোথায় বিকোবে, তা তিনি অকপটেই বলেছেন। পুরুষ কাজের লোক, ব্যবহারিক জীবন তার হৃদয়-বৃত্তিকে নিষ্পিষ্ট করে। হৃদয়কে মূল্য দেবার সময় কই ? বুদ্ধির খেলায় জিতলেই জীবনে সে সার্থক ব'লে স্বীকৃত হবে। হৃদয়কে স্বীকার করতে গেলে সে ঠকবে। নারীকে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়বৃত্তির এবং সৌকুমার্যের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তাই তাঁর আবেদন নারীর কাছে এবং ঘরছাড়াদের কাছে, সংসারে যারা বিবেচক ব'লে খ্যাতি পায় নি তাদের কাছে। তাঁর আদর্শ হল সেই 'সর্দার' বা 'মোড়ল' বা 'রাজা' যে 'সদুপদেশ' অগ্রাহ্য ক'রে, বুদ্ধির সীমার বাইরে সত্যকে খোঁজে। সৌন্দর্য তাঁর ঘরে কখন এসে উপস্থিত হয় ? না যখন তিনি বুদ্ধি দিয়ে তাকে খোঁজা ছেড়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে দেন। চাঁদের আলো ঘরে তখনই আসে। বুদ্ধি বা মনন যে সত্যাপলব্ধির সহায় নয়, সে পথে সাহায্য করে intution বা কল্পনা (রোম্যান্টিক যুগে Imagination কথাটাই এই অর্থে প্রযুক্ত হত এবং এখনও হয়)—এ ভাব সেই উনিশ শতকী প্রতীচী রোম্যান্টিসিজমের সৃষ্টি যা আঠারশতকী সুবুদ্ধির (moderation, good sense, common sense) আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে, ব্যবহারিক মূল্যকেই চরম মূল্য দিতে অস্বীকার ক'রে, যে সত্তা দৈনন্দিনের সীমার পরপারের খবর দেয়—মানুষের অসীম সম্ভাবনার উপলব্ধি ঘটায়, সেই কল্পনাবৃত্তিকেই সত্যোপলব্ধির একমাত্র মাধ্যম ব'লে স্বীকার ক'রে নিল। সেই কল্পনা আপনাকে বিস্তৃত ক'রে, জীবনের কৃত্রিমতার ঠিক বিপরীত যে বহিঃপ্রকৃতি তার সঙ্গে

মনুষ্যপ্রকৃতির সনাতন অংশের ক্রমবর্ধমান একাত্মতা অনুভব করতে থাকে এবং মানবপ্রকৃতির অবরুদ্ধ সত্তাকে অনেক সময়ে প্রকৃতির রূপের মধ্যে বৃহত্তর স্ফুটতায় অবারিত দেখতে পায় :

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশত-গীত-মুখরিত বনবীথিকা॥

ভরা বর্ষার আকাশ মেঘে, বৃষ্টিতে, বিদ্যুতে ঝড়ে প্রকৃতির প্রাণশক্তির অদম্য বিকাশ আর রইল না—হ'য়ে উঠল যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত অগণিত কবিহৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। এটিকে শুধু প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলংকার হিসেবে দেখে আলংকারিক কাজ শেষ করতে পারেন কিন্তু অলংকার এখানে আসল কথাই নয়, কথা হল রসধ্বনি—সেই ব্যঞ্জনা যার গভীরতায় এবং গাম্ভীর্যে বাচ্যার্থ এবং অলংকার সব একান্ত গৌণ। এই যে প্রকৃতি আর মানুষে বিভেদ বিলুপ্ত হয়ে, মানুষের জীবনসত্যের বিকাশের মাধ্যম হয়ে উঠল—এর গভীরতর তাত্ত্বিক তাৎপর্য পরিপূর্ণ প্যানথীইজম্ বা সর্বেশ্বরবাদ যা ভারতীয় ভাবনায় পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিসিজ্‌মের দান। কেন না ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের মূল কথা হল অলৌকিক দৃষ্টি। সে দৃষ্টি না খুললে, শুধু লৌকিক প্রজ্ঞা মানুষকে সে উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারে না। লৌকিক স্তরেই, সহস্র বন্ধনের মাঝেই সে উপলব্ধি সম্ভব পাশ্চাত্ত্যের রোম্যান্টিক প্যানথীইস্টের কাছে :

চোখ ঘুম ভ'রে আসে,
মাঝে মাঝে উঠছি জেগে।

* * * *

পাৎলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।

*　　*　　*　　*

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়

*　　*　　*　　*

কাল রাত্রি একা কেটেছে এই জানালার ধারে।
বনের ললাটে লগ্ন ছিল শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদের রেখা।
　　এও সেই একই জগৎ,
কিন্তু গুণী তার রাগিণী দিলেন বদল ক'রে
　　ঝাপসা আলোর মূর্ছনায়।
রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায়-আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
　　লক্ষ নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণকথা।
মনে পড়ছে দূর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি।
　　গাছগুলো স্তম্ভিত,
রাত্রির নিঃশব্দতা পুঞ্জিত যেন দেহ নিয়ে।

*　　*　　*　　*

এখন তাদের কোনো দায় নেই জ্যোৎস্নারাতে;
রাত্রের আলোয় গায়ে গায়ে বসেছে ওরা,

*　　*　　*　　*

যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে,
　　তাকে দেখা যায় দূরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
　　আমার চেতনায়।
　বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,

আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।

[পত্রপুট—৭]

এর একটু দূরেই রয়েছে "আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে" এবং এর কিছু আগেই রয়েছে "বসুন্ধরা"। মানুষের লৌকিক সত্তাকে এ মূল্য প্রাচ্য দেয় নি, দিয়েছে সেই প্রতীচ্য যে মধ্যযুগের কৃচ্ছ্রসাধনের পর মুক্ত, ইহমুখী মানবাত্মাকে সুখী হবার অধিকার দিয়ে উনিশ শতকের গোড়ায় এসে তার লৌকিক সত্তাকেই অলৌকিকের ভিত্তি ব'লে স্বীকার ক'রে, মানুষের অসীম মূল্য পৃথিবীর কাছে জানিয়েছে।—সীমার মাঝে অসীমের তত্ত্বের ইঙ্গিত সেইখানে। তারি জোরে রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন, মন্দিরের সনাতন দেবতাকে অস্বীকার ক'রে :

মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনাবন্ধুর পথে।

নিজের সসীমতার বোধ মানুষের কাছে বড় বেদনাদায়ক। সীমার বোধের প্রধান কারণ হল মানুষের খণ্ডকালের মধ্যে বাঁচা। রোম্যান্টিক তাই বুদ্ধির দৌরাত্ম্য ছাড়িয়ে নিজের কল্পনাকে বিহার করতে দেয় অনবচ্ছিন্ন প্রকৃতিধ্যানে। কালের গতি হয় অব্যাহত, অখণ্ড। বের্গস‍ঁ যে ভূমার কথা বলেন সে হল এই খণ্ডকালের চেতনা থেকে অসীম, অখণ্ড কালের চেতনায় উত্তরণ। প্রকৃতিধ্যান এই অসীমে পৌঁছানোর নিশ্চিত পথ, বিশেষ ক'রে প্রকৃতির অন্তরে-বাইরে যে নিরন্তর পরিবর্তন ও পরিণতির বৃত্ত-গতি রয়েছে সেই গতির ধ্যান :

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে

অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ'পরে ঝাপটিছে ডানা;

এই গতির নির্বাধ চেতনায় নক্ষত্রলোকও শিহরিত:

নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

'আলোর ক্রন্দনে'—অর্থাৎ আলোকের জন্য ক্রন্দন। কিন্তু অন্ধকার আর আলোক ত চিরন্তন দ্বৈত। অন্ধকারের আলোতে পর্যবসান ত সম্ভব নয়। তাই এই গতিরও বিরাম নেই। এখানে বের্গস-র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর সচেতন প্রভাব প্রমাণ করবার জন্যে নয়—এইটুকু দেখাবার জন্যে যে রোম্যান্টিক জীবন-দর্শনের যে পরিণতি বের্গস-তে, সেই পরিণতিই রবীন্দ্রনাথে। বের্গস-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় না ঘটলেও এই বিকাশ রবীন্দ্রনাথে অবশ্যম্ভাবী ছিল।

কিন্তু সৌন্দর্য-দর্শন এবং দুঃখ-চেতনার অধ্যায়ে প্রকৃতি (বহিঃ ও আন্তর) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে আর একটি মনোভাব আলোচিত হয়েছে সেটি শুধু প্রাচীন ভারতীয় নয়, সেটি এক অর্থে সনাতন ও প্রায় সর্বস্থানিক। মানুষের ষড় রিপু, এবং স্থূল কার্য-কারণ-সম্পর্ক-চালিত বহিঃপ্রকৃতি যা মানুষের স্থূলতাকে উদ্দীপ্ত করে অথচ যার ওপরে মানুষের চৈতন্যের কোনো অধিকার নেই—এই প্রকৃতিকে জয় করাই শুদ্ধ চৈতন্যের বিধিনির্দিষ্ট কর্ম। দেবেন্দ্রনাথের সেই কথা। রবীন্দ্রনাথও এই ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে প্রকৃতি নাম্নী অন্ধ শক্তিকে বারে বারে ধিক্কার দিয়েছেন, বলেছেন যে, মানুষের যা আসল মনুষ্যত্ব তা প্রকৃতির আয়ত্তের বাইরে, প্রকৃতি তাকে নির্জিত করতে পারবে না। 'শেষ লেখা'-র ১৫ সংখ্যক কবিতা:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী,
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

অথবা ১৪ সংখ্যক:

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

অথবা ২ সংখ্যক :

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

'প্রান্তিকে' এই মনোভাবের দ্যোতক বহু কবিতা রয়েছে,—রয়েছে সেঁজুতিতে। এই মনোভাবেরই বিকাশ ঘটে যখন তিনি নারীর যৌন আকর্ষণকে প্রকৃতির এই অশুভঙ্করতার প্রকাশ ব'লে মনে ক'রে উর্বশীর এক হাতে বিষভাণ্ড দিয়ে দেন বিনোদিনী, ঊর্মিমালা, সরলা এই প্রতীকী মূল্য বহন করছে। আবার লাবণ্য এলা প্রভৃতি নায়িকারা যে ভালোবাসাকে সবলে ঠেকিয়ে বিবাহে অস্বীকৃত হচ্ছে তারও কারণ এই যে তারা সচেতন যে তারা প্রকৃতির এই শক্তির বাহিকা—তারা পুরুষকে নামিয়ে আনবে। রবীন্দ্রনাথের একেবারে সর্বশেষ গল্পগুলিতে পর্যন্ত নারীর এই রূপের সঙ্গে তার আদর্শ কল্যাণী রূপের দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। এই মনোভাবই রবীন্দ্রনাথকে কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মনিগ্রহী সন্ন্যাসের পথে ঠেলে দিতে পারত যদি প্রতীচ্যের রোম্যান্টিক প্রকৃতিপ্রেম তাঁকে ইহমুখে টেনে না রাখত। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণই রবীন্দ্র কাব্যের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের উৎস এবং এই ambivalence বা দ্বিমুখী প্রবর্তনাকে না বুঝে রবীন্দ্রনাথকে এই ছকে কিংবা ঐ ছকে ফেলবার চেষ্টা হাস্যকর।

প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রকাব্যে তৃতীয় একটি স্তর আছে। সেই স্তরে তিনি এই দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজেছেন। সেটি হল সুন্দর আর সত্যকে, সহজকে আর আদর্শকে, স্থূলকে আর মঙ্গলকে এক সত্তায় বা অনুভূতিতে ধরবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস এই চেষ্টায় সার্থক হয়েছেন শকুন্তলায় এবং কুমার সম্ভবে। এই স্তরে অবশ্য বহিঃপ্রকৃতি আন্তঃপ্রকৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ

করছে—মানুষের সহজাত স্থূল প্রবৃত্তিরূপে। চণ্ডালিকায় যৌবনের ইন্দ্রজালকে উত্তীর্ণ হয়ে মঙ্গলকে গ্রহণ করছে চণ্ডালকন্যা—দুঃখের মধ্যে দিয়ে দেহসর্বস্বতাকে কাটিয়ে উঠে। শাপমোচনেও ঐ এক সত্য অন্য রূপে প্রকট। শেষ লেখার ১১ সংখ্যক কবিতায় এই অনুভূতির অতি-সংহত, তীব্র প্রকাশ :

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

মায়া ব'লে উড়িয়ে দিলে ত সমস্যা চুকেই গেল। তা যে কোনো কোনো কবিতায় দেন নি তা নয়। কিন্তু এ যেন জড়ের, অচেতনার আক্রমণ থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে, প্রথম নিশ্বাস নিতে সমর্থ হয়ে কবি ব'লে উঠলেন : "স্বপ্ন নয়।" নটীর পূজায় নটীর আত্মদানের মানসিক ইতিহাসও হচ্ছে এই আত্মিক পুনর্জন্মের, এই স্বর্গ-মর্ত্যকে এক উপলব্ধিতে বিলীন করবার :

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে,......
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥

কিংবা সেঁজুতির প্রথম কবিতায়, স্থূল, জড়ের শক্তিকে ধিক্কার দেবার পর :

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি'
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে **তোমার** অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট র'বে।

মৃত্যুকে পরিণতি ব'লে মেনে নেবার যে সাহস, তাকে শুধু জড়ের শক্তি ব'লে ঘৃণা ক'রে দূরে সরিয়ে না রেখে কাছে ডাকবার যে সাহস তাও বারে বারে তাঁর মধ্যে দেখা যায়। গানে এ কথা বারে বারে ধ্বনিত, কবিতাতেও বহুবার :

ওই যে শিমুল ওই যে সজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে,—

কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ চৈতালিতে।......
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
এই সত্যের ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাত-রবি।
সে-রবিরে চেয়ে কবির সে-বাণী আসে অন্তরে নামি'—
"যে-আমি রয়েছে তোমার আমায় সে-আমি তোমারি আমি।"
সে আমি সকল কালে
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

প্রকৃতিকে দেখার নানা বিচিত্র ভঙ্গির মধ্যে চতুর্থ একটি স্তরেরও দেখা-পাওয়া যায়। এই স্তরে কবি জড়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে চৈতন্যসর্বস্বতায় আশ্রয় নিয়েছেন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে। [শ্যামলী]

কিন্তু এর সঙ্গে সার্থক্য রয়েছে Coleridge এর Ode to Dejection এর। সেখানে কবি এই উপলব্ধিতে ক্ষুব্ধ যে "We receive but what we give." অতএব সবই হল মনের মায়া এবং সে মায়া-সৃষ্টির ক্ষমতা Coleridge-এর মত রোম্যান্টিকের চ'লে যাবার ইঙ্গিতমাত্রে তিনি একেবারে নিরানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্যান্থীইজম্‌কে ছাড়িয়ে স্পিনোজার Pan-en-theism-এ যেন চ'লে যাচ্ছেন। আমাদের মায়াবাদী অদ্বৈত বেদান্তের প্রস্থানকে ছেড়ে দিলে অদ্বৈত-

বাদের যে ধারাটি তন্ত্রে স্বীকৃত, সেখানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই চৈতন্যের নানাস্তরের ঘনীভবনের রূপে দেখা হয়েছে। এই অর্থে কিছুই একেবারে জড় নয়। যাকে জড় ব'লেই মনে হচ্ছে তার মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণ অতি ক্ষীণ, তার মোহাবরণ অতি ঘন। তবু সে শুদ্ধ চৈতন্যেরই রূপভেদ। গোলাপ তাই চৈতন্যেরই স্পর্শে আপন জড়ত্বের আবরণ ভেদ ক'রে স্পন্দিত হয়ে উঠতে পারে সেই কবির দৃষ্টিতে যাঁর দেখার চোখ আছে :

বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালী।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।

[রোগশয্যায়]

এই মানসিকতার প্রথম, সরল প্রকাশ :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর।

তবে এ কবিতায় কবির চৈতন্য চতুর্দিকে আপনাকে বিস্তার করতে চায়—নিজের চৈতন্য দিয়ে জগৎব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এ হল রোম্যান্টিসিজ্‌ম্। আর যেখানে 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ' সেখানে আর কিছু করবার বাসনা নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই—শুধু প্রকাশকে নিরীক্ষণ করা। এ হল বস্তুকে চৈতন্যে ধারণ করা—বস্তুকে মানুষের পক্ষে অর্থবান ক'রে তোলা—বস্তুর সঙ্গে চৈতন্যের অভেদ অবস্থার আস্বাদন। একটি হল রোম্যান্টিকের অহং-সর্বস্বতা আর একটি হল চূড়ান্ত আত্মবিলোপ। জড়ে-চৈতন্যে এই অভেদ অবস্থার আস্বাদনে চৈনিক তাও-বাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছে কি না চিন্তা করবার বিষয়। কেন না চীনের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগাযোগ বহু কাল থেকে আমাদের ত আছেই; তার ওপর রবীন্দ্রনাথ সেই যোগাযোগকে নবায়িত করেন, চৈনিক বিদ্যার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে করেন। বিশেষ ক'রে তাও-বাদ আর ভারতের তত্ত্ববিদ্যা অতি কাছাকাছি জিনিষ। তাওবাদের মর্মকথা হল :

Without stirring abroad
One can know the whole world ;

Without looking out of the window
One can see the way of heaven.
The further one goes
The less one knows.
Therefore the sage knows without having to stir,
Identifies without having to see,
Accomplishes without having to act.

[*Tao TE Ching* : XLVII—106 & 107]

তুলনীয় :

বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥ [স্ফুলিঙ্গ]

অথবা

বার বার মনে মনে বলিতেছি, 'আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে। [জন্মদিনে]

‘শুদ্ধিপত্র, অনুবাদ ও নির্ঘণ্ট’

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৭	মাধ্যমে	মাধ্যমে।
১৭	৬	Cantile	Canticle
৩৫	২৬	Loving	living
৫২	৭	দেবলোকবাসিন	দেবলোকবাসিনাঁ
৫২	৮	তোমা	তোমার
৭৯	১৯	করিতে	করতে
৭০	২২	পেয়ে বসে	পেয়ে বসে।
৫৯	২৫	অকর্ষণে	আকর্ষণে
৫৯	২৫	করে	ক'রে
৬৫	২৩	সন্ধ্যানে	সন্ধানে
৮০	২	শষ	শেষ
১০৭	১৮	বিবিত্ররূপিণী	বিচিত্ররূপিণী
১০৮	৪	স্বকৃত	স্বকৃত
১০৮	১৫	Phycological	Psychological
১১০	৮	বিপীরীতে	বিপরীতে
১১৬	৫	জাবমুক্ত	জীব মুক্ত
১২৩	১৩	অনাশক্তির	অনাসক্তির
১২১	৪	শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্	সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম
১২৮	৭	পদস্পৃশো	পদস্পৃশো
১২৮	১০	কৃষ্ণরূপে	কৃষ্ণরূপে
১৩২	১০	প্রবিত্তির	প্রবৃত্তির
১৩৯	২৬	কি ক'রে	কি ক'রে]
১৪১	৭	হিউম্যানিষ্টিক	হিউম্যানিস্টিক

অনুবাদ

(১)

'আমরা পরস্পরের কাছে যথেষ্ট দর্শনীয়' এপিকিউরাসের এই কথাটি অর্বাচীন-সুলভ। যে মানুষ তৈরী হয়েছে স্বর্গ এবং যা কিছু মহৎ তাই চিন্তা করবার জন্যে সে কি না আর কিছু না ক'রে, একটি ছোট্ট পুতুলের সামনে নতজানু হয়ে, নিজেকে, পশুদের মত, উদরের না হ'ক, সেই চোখের ক্রীতদাস বানাবে যে চোখ সে পেয়েছিল মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। এই আবেগের আতিশয্য এবং বস্তুর প্রকৃত মূল্য অস্বীকারে এ যে কতদূর যায় তা এই থেকে বোঝা যায়—প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই অবিরাম অতিশয়োক্তি শোভা পায় না।

(২)

তারা স্বপ্রকৃতিকে পরিহার ক'রে মানুষ আর থাকতে চায় না। এ হল পাগলামি : দেবতায় পরিণত না হয়ে তারা পশুতে পরিণত হয়; নিজেদের উন্নীত না ক'রে তারা অবনীত করে। অলৌকিকত্বের এই ভাবখানায় আমার ভয় লাগে।

(৩)

কল্পনার চূড়ান্ত রোম্যান্টিক মুক্তির আনুষঙ্গিক হল আবেগের চূড়ান্ত সমানুপাতিক মুক্তি।··· রোম্যান্টিকের কাজ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় অসীম, অনির্দিষ্ট বাসনার পূর্তির কল্পনা, আবেগের লক্ষ্যহীন, সীমাহীন ভবঘুরেমি।

(৪)

রুশোর প্রেম বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নয়, আবেগের সঙ্গে; তাই তাঁর মধ্যে পাই 'অতি-সূক্ষ্মান্বিত, অতি-শোভন বীরপনা'-র বদলে আদিম আবেগের জলোচ্ছ্বাস।··· আত্মাকে এমন ক'রে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে নিযুক্ত করা হয় যে ইন্দ্রিয় এক প্রকারের অসীমতা অর্জন করে। কুমারী মেরীর কাছে লাতিন স্তবের আকারে এক স্তব রচনা করেন বোদলেয়ার এক প্যারিসীয় শ্রমিক মেয়ের উদ্দেশে। কেননা রোম্যান্টিক প্রেমের উল্লাসে আত্মসমর্পণ করতে

চাইলেও নিজের অহং-কে ছাড়িয়ে যেতে সে চায় না। পিগম্যালিয়ন শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল সে ত তার চিত্তের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু প্রতিবিম্ব কোনো অর্থেই বাস্তব নয়। রোম্যান্টিকের বিশ্বে বস্তু নেই, শুধু অহং আছে। এই অহং-সর্বস্ব প্রেম আসলে কল্পনাকে নিয়োজিত করে আবেগের উন্মাদনা বাড়াবার কাজে, অথবা বলা যেতে পারে, শুধুই মায়ার পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্যে।

(৫)

মানুষের সহজাত মহত্ত্বের স্বীকরণ রুশোর দর্শনের মূলে রয়েছে, কিন্তু এর চেয়েও মৌলিক হল মানুষের চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের—কু আর সু-র দ্বন্দ্বের—অস্বীকরণ। মানুষের অন্তরেব যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর ধর্মের ভিত্তি রচিত তার আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। কেবল কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থা থেকে প্রকৃতির মধ্যে পালালেই এই কৃত্রিমতারই অংশ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার স্থান গ্রহণ করবে সুষমা আর সৌন্দর্য।··· রুশোর চেয়ে আরও স্পষ্ট ক'রে এই নূতন নীতি-বোধের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি দিদিরো ব্যাখ্যা করেছেন : "আমাদের সকল দুঃখের কাহিনী এক কথায় শুনতে চান? একদা একটি সহজ মানুষ ছিল। এই সহজ মানুষটির ভেতর একজন কৃত্রিম মানুষকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে শুরু হয়েছে মানুষের সারাজীবনব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

(৬)

দৃশ্যমান জগতের বস্তুভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যায় আদিম মানুষের তেমন আগ্রহ নেই, কিন্তু তার অবশ্য প্রয়োজন আছে—বরং বলা যেতে পারে তার অচেতন মনের অদম্য আগ্রহ আছে—ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্য অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ মানসিক বা আত্মিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করবার। সূর্যের উদয় অস্ত দেখাই আদিম মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; এই বাহ্য পর্যবেক্ষণটি একই কালে আত্মিক ঘটনাও হওয়া চাই। চলমান সূর্যকে হয়ে উঠতে হবে কোনো দেবতা বা বীরের ভাগ্যের প্রতীক এবং সেই দেবতা বা বীরের চূড়ান্ত আবাস হল মানুষেরই অন্তরের মধ্যে।

(৭)

সেই হতভাগিনী যার নাম উচ্চারণে লজ্জা; যে শুষ্ক হৃদয়ে ভালোবাসার ভান ক'রে, যৌন কামনার শিকার হয় বিনা প্রতিবাদে, যে নারীজাতির

মধ্যে ঘৃণ্যতম জীব হিসেবে অপমানিত হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ, চূড়ান্ত দৈন্য এবং অকাল মৃত্যুর কবলে পড়ে, সেই যুগে যুগে মানুষের পাপ আর অধোগতির চিরন্তন প্রতীক হয়ে আছে। সে নিজে নিকৃষ্টতম পাপী হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত, সে-ই পুণ্যের শ্রেষ্ঠ রক্ষয়িত্রী। তার অভাবে অসংখ্য গৃহের অনাহত পবিত্রতা কলঙ্কিত হত, এবং অনেকেই যাঁরা, প্রলোভনে পড়েননি ব'লে সতীত্বে অহঙ্কৃত এবং এই জীবটির কল্পনামাত্রে ভয়ে কেঁপে ওঠেন, তাঁরা হতাশা আর অনুতাপে দগ্ধ হতেন। ঐ একই অধঃপতিত ঘৃণ্য জীবটির উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে ততই কামনাপুঞ্জ যা পৃথিবীকে লজ্জায় ভ'রে দিয়েছে। মতবাদ এবং সভ্যতা যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে তবু ঐ বেশ্যা রয়েছে মনুষ্য-সমাজের চিরন্তনী কল্যাণী, মানুষেরই পাপে বিধ্বস্ত।

(৮)

সাধারণভাবে সতী গ্রীক নারীর স্থান সমাজে খুব নীচুই ছিল।… একমাত্র সেই সব নারীরাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত যারা পরকীয়া বা বেশ্যা। … শ্রেষ্ঠত্বের গ্রীক ধারণা হল কৃচ্ছ্রসাধনের সম্পর্কবিহীন দেহ-মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ।… এবং অত্যন্ত সদাচারী মানুষেরা সদাসর্বদাই খোলাখুলিভাবে এমন এমন সব সম্পর্ক গড়তেন যার এখন প্রায় সকলেই নিন্দা করবে। আফ্রোদিতির সকাম পূজা বেশ্যাবৃত্তিকে এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তাঁর মন্দিরে তারাই ছিল পূজারিণী।… বেশ্যাই প্রায়শ সৌন্দর্যের রাণী ব'লে স্বীকৃত হত। যে আফ্রোদিতির মর্মর-মূর্তি গ্রীসের বিস্ময় সেই মূর্তির মডেল হত বেশ্যা। প্রাক্সিতিলিস বেশ্যা ফ্রিনের প্রতিমূর্তি গড়তেই অভ্যস্ত ছিলেন। এবং তারই স্বর্ণময় মূর্তি দেল্‌ফি-তে আপোলোর মন্দিরে রক্ষিত ছিল। যখন যুবকদের নষ্ট করার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন তার উকিল হাইপিরাইদিস তাকে মুক্ত করেছিলেন সমবেত বিচারকদের সামনে তার নগ্ন সৌন্দর্য হঠাৎ অবারিত ক'রে, তাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে।… পিণ্ডার এবং সিমনাইদিস বেশ্যাদের প্রশংসায় কবিতা লিখেছিলেন এবং প্রাজ্ঞ দার্শনিকেরা তাদের দেখতে তীর্থযাত্রা করতেন। তাদের নাম প্রতি নগরেই সুবিদিত ছিল।

(৯)

শাতুব্রিয়াঁতে এই পরনিগ্রহের উন্মাদনার সঙ্গে রোম্যান্টিকের দিবাস্বপ্নের

মিশ্রণের মত অদ্ভুত জিনিষ কমই আছে।‥ কাক্‌তাসের প্রতি ভালবাসা এবং নিজের ধর্মমতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বর্ণনায় আতালার মুখ থেকে যে মত্ত আক্ষেপ নিঃসৃত হয়েছে তা মানুষের মুখ থেকে আর কখনও বেরোয়নি : বেদনা-ভিভূত হৃদয়ে কি স্বপ্নই আমি না দেখেছি। মাঝে মাঝে, তোমার দিকে তাকিয়ে, কত উদ্ভ্রান্ত পাপ-বাসনা আমার মনে জেগে উঠত : কখনও মনে হত জগতে শুধু আমরা দুজনেই বেঁচে আছি; কোনো দৈব শক্তি আমার ভয়াবহ উল্লাসে বাদ সাধছে মনে হলেই আমি চাইতাম সে দেবতা মরুক আর আমি এবং তুমি আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে গহ্বর থেকে গহ্বরে ছিটকে ছিটকে পড়ি, স্বর্গ-মর্তের ধ্বংসলীলার মধ্যে।" হ্বাগ্‌নারের 'ত্রিস্‌তান ও আইসোলদ্‌'-এর মত, কামনা এখানে উত্তুঙ্গ স্তরে উঠে সর্বনাশের বাসনার মধ্যে সমাহিত হয়েছে।

(১০)

এ কথা খুব সত্যি যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সসীমে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তার চলা বন্ধ হলেই বৈক্লব্যের প্রেতচ্ছায়া তাকে পেয়ে বসে না। মানুষকে বাস্তবিকই বলা যায় তৃপ্তিহীন জীব; আর যতই সে কল্পনা-প্রবণ হয় ততই তার অতৃপ্তি বেড়ে চলে কেন না কল্পনাই তার কাছে অসীমের সম্যক্ অনুভূতির দ্বার খুলে দেয়।… ধর্ম যেমন এই বৈক্লব্য থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায়, রোমান্সও তেমনি। কিন্তু ধর্ম আর রোমান্সের প্রস্তাবিত প্রতিষেধকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। রোম্যান্টিক বোদলেয়ার এই বৈক্লব্যের হাত থেকে নিস্তার পেতে চাচ্ছেন চূড়ান্ত আবেগের অভিসার-স্বপ্নে, অসীম অস্পষ্ট কামনার বিলাসে এবং শেষ পর্যন্ত তারি খোঁজে অস্থির হয়ে ওঠেন যা কেবল হাত ফস্কে যায়। এই যে মন-কেমন-করার অসীমতা এর সঙ্গে ধর্মবোধের অসীমের কোনো মিল নেই। ধর্ম-প্রেরণার যে স্বর্গীয় অসন্তোষ আর রোম্যান্টিকের অস্থিরতা—এই দুই-এর পার্থক্য বোঝার চেয়ে বেশী দরকারী আর কিছুই নেই। ধর্ম বলে যে, সসীম যে তৃপ্তি দিতে পারছে না সে তৃপ্তি বাইরে না খুঁজে ভেতরে খুঁজতে হবে, এবং ভেতরে তাকাতে হলে তাকে, যাকে বলে, আক্ষরিক অর্থে ধর্মান্তরিত হতে হবে। তখন তার সামনে এমন এক পথ উন্মুক্ত হবে যার শেষ নেই। সে শুধু বোঝে যে এই পথে এগিয়ে যাওয়া মানেই হল ক্রমবর্ধমান শান্তি, স্থৈর্য এবং কেন্দ্রিকতা

অর্জন করা। সে শান্তি ক্রমান্বয়ে গভীরতর কেন্দ্রের ইঙ্গিত দিতে থাকে ...। মানুষের লভ্য এই আন্তর শান্তিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রে ধরা না গেলেও, বাস্তব জীবনাচরণে এর প্রভাব অনুভব করা যায়। আবার ব্লেকের ক্ষেত্রে...ধর্মই হয়ে উঠেছে বেগবান, অস্থির কল্পনার খেলার জিনিষ। আমাদের বোঝানো হচ্ছে এই হল অতীন্দ্রিয়বাদ। আমি আগেই, এই জাতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে, এই নামেই প্রচলিত কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি মনোভাবের পার্থক্য নির্দেশ রেছি—প্রাচীন ভাবতের অতীন্দ্রিয়বাদ। কেবলই মনকে ছড়িয়ে দিয়ে ভূম উপলব্ধি করার ধারণার বদলে প্রাচ ঋষ্যি এর সংজ্ঞা দেন 'আন্তর নিবৃত্তি মার্গ'।

(১১)

সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষাদের, অভিশপ্ত সৌন্দর্যের, অপূর্ব মনোহারিতার বিষয়ে লেখার অসংখ্য নিদর্শন উদ্ধার করা যেতে পারে রোম্যান্টিক এবং অবক্ষয়ের যুগের লেখকদের রচনা থেকে। যে বিক্তর উগোর শিরায় নিশ্চয়ই শেলী, কীট্‌স্‌, ফ্লবেয়ার এবং বাদলেয়ারের ক্লিষ্ট রক্ত প্রবাহিত হত না তিনিও, বোদলেয়ারের মত, গুরুত্ব দিয়েই মৃত্যুর সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। বাস্তবিক রোম্যান্টিকদের কাছে মৃত্যু এবং সৌন্দর্য এমন সহাদরা স্থানীয় হয়ে উঠেছিল যে তুয়ে মিলেছিল এক উভলিঙ্গ জীবে যার মধ্যে সমাবিষ্ট ক্লেদ, বিষাদ এবং সর্বনাশা সৌন্দর্য—এমন সৌন্দর্য যার তিক্ততা উপভোগের স্পৃহাকে বাড়িয়েই তোলে।

(১২)

'হে বৎস, তুমি যোগক্ষম, তুমি এমন কাজ কর না। তুমি আবার মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর পূজা কর, তাহলেই তিনি আবির্ভূত হয়ে বর দেবেন। তিনিই মহাশক্তি। তিনি সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি কোটি সূর্যের ন্যায় ভাস্কর; তিনি নালা। তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ। তিনি কালকামিনী। তিনি সব কিছুর আদি। তাঁতে ধর্মও নেই, অধর্মও নেই। তিনি সর্বরূপা। তিনি শুদ্ধ চীনাচার-রতা। তিনি শক্তি চক্রের প্রবর্তিকা। তাঁর মহিমা অসীম। সংসার সমুদ্র উত্তরণে তিনি সাহায্য করেন।...তিনি জীবকে রক্ষা করেন। স্থাবর ও জঙ্গমে তিনি ক্রিয়াশীল। তাঁতে সম্পূর্ণ মগ্ন হলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

(১৩)

আমার ধ্যানে ক্লেশ নেই, কৃচ্ছ্রসাধন নেই।...আমার সাধনা শুদ্ধ, বেদেরও সীমার বাইরে।...তিব্বতে যাও, বৌদ্ধদের দেশে; সর্বদা অথর্ববেদকে অনুসরণ কর। সেখানে গিয়ে, যার নাম মহাভাব আমার সেই চরণপদ্ম দর্শন ক'রে, হে মহর্ষি, তুমি আমার কুলে দীক্ষিত হয়ে, মহাসিদ্ধ হবে।

(১৪)

"সে আচার দর্শন ক'রে আমার মন সন্দেহাক্রান্ত হয়েছে (কেন না সেখানে তিনি আসব এবং স্ত্রীলোক সহযোগে অদ্ভুত সব অনুষ্ঠানাদি দেখেছিলেন)।... যে সব সিদ্ধেরা এত উচ্চ কোটির যে ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন তাঁরাও কি ক'রে নগ্ন হয়ে মদ্য, মাংস, এবং নারী উপভোগ করেন! তাঁরাও অবিরাম পান করেন এবং সুন্দরী নারীতে রমণ করেন।...তাঁরা বেদ-বহির্ভূত।...এই সব প্রবণতা মনকে শুদ্ধ করবে কি ক'রে। বৈদিক অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হবে কি করে।

(১৫)

"চীনাচার ব্যতিরেকে তুমি আমাকে তুষ্ট করতে পারবে না। উদ্বোধরূপী বিষ্ণুর কাছে যাও এবং তাঁর নির্দেশিত আচারে আমার আরাধনা কর।" বশিষ্ঠ তখন মহাচীনে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সে দেশ হিমালয়ের ধারে। সেখানে সাধকেরা থাকেন আর থাকেন সহস্র সহস্র সুন্দরী যুবতী যাঁদের চিত্ত আসবপানে হৃষ্ট এবং বিলাসে আনন্দিত। তাঁরা শৃঙ্গারবেশধারিণী; তাঁদের আন্দোলিত জঘনে শিঞ্জিনী ঝঙ্কৃত হয়। আচার-সর্বস্ব লজ্জা ও ভয় থেকে মুক্ত তাঁরা জগৎকে বিমোহিত করেন। তাঁরা দেবীর আরাধনায় রত এবং ঈশ্বরকে বেষ্টন করে আছেন।

(১৬)

"সদাচারী তুমি এ রূপ চিন্তা কর না। তারিণীর সাধনায় এই আচার শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ।...এটি অভ্যাস করলে তুমি সংসার-সমুদ্রে আর নিমজ্জিত হবে না। এ সাধনা তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী, এবং সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী। যে প্রচলিত সাধনার ঊর্ধ্বে এখন সাধক উঠেছেন তার সাধারণ আচারাদি যে এই বিশিষ্ট সাধনায় নেই সেই বিশেষ দিকটি এখন বিষ্ণু ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন।

(১৭)

"আহার ক'রেও দেবীর পূজা করা চলে, অপবিত্র স্থানেও চলে। নারী তাঁরই রূপ, তাই পূজ্য। তাকে কখনও দ্বেষ করা উচিত নয়।"

(১৮)

প্রাণের বিবর্তনের কালে অসংখ্য অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলাবদ্ধ নথি অথবা সেই প্রজাতির জীবধারার বিবর্তনের কালে যার থেকে মানুষের উৎপত্তি। এর মধ্যে যে সমস্ত এক ধরণের অভিজ্ঞতার সব চেয়ে বেশী পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেইগুলিই পরম্পরাক্রমে, সুদে-আসলে, বংশধরে সঞ্চারিত হয়ে, বুদ্ধিমত্তার সেই উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে যা শিশুর মস্তিষ্কে সুপ্ত হয়ে আছে। সেই জন্যেই একজন পাপুয়ানের চেয়ে একজন ইউরোপীয়ান বিশ থেকে ত্রিশ কিউবিক ইঞ্চি বেশী মস্তিষ্ক পেয়ে থাকে। এই জন্যেই, সেই সব বৃত্তিগুলো (যেমন সঙ্গীতের সামর্থ্য) যেগুলি নিম্নতর মনুষ্যদের মধ্যে নেই বললেই চলে সেগুলি উচ্চতর জাতিদের মধ্যে প্রায় জন্মগত হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই যে সব অসভ্যেরা কর গুণতে জানে না এবং যাদের ভাষায় শুধু বিশেষ্য আর ক্রিয়া ছাড়া কিছু সেই তাদের ধারাতেই আমাদের নিউটন এবং শেক্সপীয়রেরা জন্মেছে।

(১৯)

মানুষের বংশ-পরাম্পরা-ক্রমে সঞ্চারিত, স্থিতিশীল একটি কাঠামো হিসেবে অচেতন বা নির্জ্ঞান মন সব সময়েই রয়েছে। চেতনা হল অচেতন মনের এক আধুনিক সন্তান। আমরা বংশধরদের দিয়ে আদি-পুরুষের জীবনের ব্যাখ্যা দিতে গেলে সেটা যেমন অদ্ভুত শোনাবে তেমনি ভুল হবে, আমার মতে, অচেতন মনকে চেতন থেকে উদ্ভূত ব'লে মনে করলে। ঠিক উল্টোটা বললে বরং সত্যের কাছাকাছি হবে।

কিন্তু এইটেই ছিল প্রাচীন কালের মত। সে কাল মনে করত ব্যক্তিসত্তা জগৎ-সত্তার ওপর নির্ভরশীল। সে কালের লোকেরা লক্ষ্য না ক'রে পারে নি ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী চেতনার তলে কি অপরিসীম অভিজ্ঞতার সম্পদ সঞ্চিত আছে। এই সব যুগে জগৎ-সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে শুধু যে একটি প্রকল্পই করা হয়েছিল তাই নয়, তারা বিনা প্রশ্নে ধ'রে নিয়েছিল এই সত্তার ইচ্ছাশক্তি এবং চেতনা আছে—এমন কি সে একটি ব্যক্তি—নাম দেওয়া হল ঈশ্বর, জগতের সারাৎসার। তাদের পক্ষে তিনি হয়ে উঠলেন সব চেয়ে সত্য, জগতের আদি কারণ, যাঁর মাধ্যমেই

কেবল ব্যক্তি-সত্তার উপলব্ধি হতে পারে। এই বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে কেন না এমন একটি মৃত্যুহীন সত্তা যার অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির তুলনায়, প্রায় শাশ্বত, তাকে ভগবান না ব'লে আর কি বলা যায়।

(২০)

প্রথমত সত্তা এবং তার বোধ এবং পরে সেই বোধ ও তার প্রকাশ এই সম্পর্ককে উপলব্ধি করার নামই হল সত্য আর সুন্দরের উপলব্ধি—এক কথায় কল্যাণের উপলব্ধি।...কেন না তিনি যে শুধু বর্তমানকেই গভীর ভাবে বোঝেন এবং সেই সেই বিধিকে আবিষ্কার করেন যেগুলি অনুসারে বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, তাই নয়, তিনি বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে দেখেন এবং তাঁর ভাবগুলি হল সর্ব-সাম্প্রতিক কালের ফুল এবং ফলের বীজ-স্বরূপ। আমি অবশ্য স্থূল অর্থে কবিদের দ্রষ্টা বলছি না বা বলছি না যে তাঁরা ঘটনার মূল সত্য যেমন উপলব্ধি করেন তার ভাবী রূপও তেমনি ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারেন। কবির অদ্বৈত, নিত্য, শাশ্বতের বোধ ঘটে। তাঁর বোধ দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কাব্যের ক্রিয়া অন্যভাবে ঘটে, (নীতি উপদেশের ক্রিয়ার প্রকারের চেয়ে) দিব্যতর প্রকারে। এ পর্য্যন্ত অনুপলব্ধ হাজারো ভাব ও তাদের সম্পর্ক চিত্তে সঞ্চার ক'রে তাকে আরও অনুভূতি-প্রবণ, আরও উদার ক'রে তোলে। জগতের গুপ্ত সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন তুলে ধরে কাব্য, পরিচিতকে অপরিচিতের রূপ দেয়, যা দেখায় তাই সৃষ্টি করে এবং দিব্য আলোকে আবৃত এই সব মূর্তি, জীবনের তাবৎ ভাব ও কর্মের সহগামী সেই স্নিগ্ধ, সু-উচ্চ আবেশের স্মারক হিসেবে, দরদী চিত্তে অবস্থান করে। নৈতিক সত্য উপলব্ধির প্রকাণ্ড রহস্য হল প্রেম; নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ানো, আমি ছাড়া জগতের আর যা কিছু সুন্দর তার সঙ্গে একাগ্রতা বোধ। মহৎ কল্যাণবোধে জাগ্রত যে হবে তার কল্পনা জাগ্রত, বিশ্বতোমুখ হওয়া চাই;...স্বজাতির সকল দুঃখ আনন্দকে আপনার ক'রে নিতে হবে। নৈতিক কল্যাণের মহৎ সহায় হল কল্পনা।

(২১)

ভগবানের এ শাস্তি প্রাপ্য হল কেন? এ প্রশ্ন করা প্রায় পাপ করার সমান। তবে আমি ত আর শিশুদের জন্যে লিখছি না। ঈশ্বরের এই আত্মদান স্পষ্টত শাস্তিমূলক মনে হওয়ায় এ প্রশ্ন করতেই হবে। চলিত ব্যাখ্যা হল এই যে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্যে শাস্তি পেয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যার পেছনের প্রচলিত

মতবাদকে আমি সন্দেহ করছি না, ধর্মীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শুধু এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত মানসিক ক্রিয়াটিকে নিরূপণ করতে চাইছি ব'লে শাস্তির সমানুপাতিক অপরাধ, যুক্তির খাতিরে, আমাদের ধ'রে নিতেই হবে। অপরাধ যদি মানুষই ক'রে থাকে তাহলে যুক্তির খাতিরে সে শাস্তি মানুষের প্রাপ্য। কিন্তু ভগবান যদি সে শাস্তি নিজে গ্রহণ ক'রে, মানুষকে মুক্তি দেন, তখন আমাদের অনুমান ক'রে নিতে হয় যে, মানুষ দোষী নয়, ভগবানই দোষী (তাই তিনি অপরাধের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন)। সহজেই বোঝা যায় কেন সনাতন খ্রীষ্টধর্মের কাছ থেকে এ সমস্যার সদুত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যাবে ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে, নস্টিক মতবাদের কাছ থেকে, ক্যাথলিক দার্শনিক চিন্তা থেকে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে ইয়াওয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক হলেও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না এবং তাঁকে মাঝে মাঝে এমন ক্রোধে পেয়ে বসত যে পরে তার জন্যে তিনি খেদ করতেন। কতকগুলি নস্টিক দার্শনিক চিন্তাধারা থেকেও স্পষ্ট হয় যে, স্রষ্টা একজন নিম্নতর নিয়ামক। তিনি একটি দোষ-খণ্ডিত জগৎ সৃষ্টি ক'রে, ভ্রান্তিবশে ভেবেছিলেন যে এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গম্ভীর, বিষণ্ণ প্রকৃতির ব'লে, ইহুদীদের যে ইয়াওয়ে জগতের স্রষ্টা, তাঁর সঙ্গে এঁর সাদৃশ্য আছে। তাঁর সৃষ্টিও দোষাবিষ্ট ব'লে উন্নতির পথে যাচ্ছিল না। কিন্তু ভাঁড় খারাপ হলে যেমন কুমোরকে ছেড়ে দিয়ে ভাঁড়কে দোষ দেওয়া চলে না তেমনি এ ক্ষেত্রেও স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্ট জীবকে দোষ দেওয়া যায় না!...ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যার যুক্তি মেলে নি এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে তা পাওয়া গেল। ভগবানের অপরাধ হল এই যে, জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক হিসেবে তিনি অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়েছেন এবং তাই তাঁর এই আনুষ্ঠানিক নিধন।

নির্ঘণ্ট

বিষয় ও চরিত্র

এ্যা

ই

ঈ

ন

প

ভ

ম

য

র

ল

শ

ষ

স

হ

গ্রন্থ, সন্দর্ভ, কবিতা,

প্রতিষ্ঠান ইঃ

ক

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ড

ত

দ

ন

প

ফ

ব

স

হ

ক্ষ

গ্রন্থকার, চিত্রকর, ইং

গ

চ

জ

ট

ঠ

ড

দ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম